প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস,
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিয়বন্ধু

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

করকমলে

সূচী

জলছবি

মণি-প্রদীপ

এই বসন্তকালে একটি বেদনা আমার বুকের মধ্যে অনবরত বাজ্‌তে থাকে। পৃথিবীতে এই বসন্ত বারবার আসে-যায়; কিন্তু আমার জীবনে একটিবারমাত্র বসন্ত এসেছিল। কোথায় গেল আমার সেই প্রাণের নবীনতা, কোথায় গেল সেই হৃদয়ের গুঞ্জন-গান, কোথায় গেল এই বসন্তের মত্ত হাওয়ার মতো আমার মাতলামি! রঙের সেই নেশা, সুরের সেই তন্দ্রা, গন্ধের সেই আকুলতা কেমন ক'রে ম'রে গেল!

জীবনে সেই একটিবারমাত্র বসন্ত এসেছিল। সে কাজ চুকিয়ে চ'লে গেছে—তার শেষ-কথাটি আমার কানেকানে গুঞ্জন করে বিদায় নিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি কি তাকে জীবন থেকে বিদায় দিতে পেরেছি? জানি, সে আর ফিরবে না, আশা তার আর রাখিনে, তবু তো তাকে ভুলতে পারছিনে!

আমি তো চিরকেলে একটা নীরস মানুষ;—কল্পনার দোলায় দোলখাওয়া তো কখনো আমার স্বভাব নয়—এ ত সবাই জানে! তবে আমার এ কি হ'ল? কেমন ক'রে আমার সমস্তটা এমন ওলট-পালট হয়ে গেল!—কিসে আমায় এমন-তর নূতন করে তুল্লে! আমি যা নয়, শেষে তাই হয়ে গেলুম!

যারা কাব্য নিয়ে থাকে, চিরদিন আমি তাদের ঠাট্টা ক'রে এসেছি। কল্পনায় যারা কল্পলোকের স্বপ্নপুরীতে বাস করে, তাদের দিকে আমি চিরকাল কৃপার চক্ষে চেয়ে এসেছি। গানের যে কোনো মূল্য আছে—এ আমার কোনো দিন বিশ্বাস ছিল না;—কানের তৃপ্তির চেয়ে উদরের তৃপ্তির জন্য সমস্ত বিশ্বমানব আর্ত্তনাদ করছে, এ তো প্রত্যক্ষ চোখে দেখ্‌ছি।—তাকেই আমি বড় ক'রে দেখেচি। সেই-আমার এ কি হ'ল?

আমার এখন মনে হচ্চে, আমার এই প্রাণের কান্না

গান গেয়ে না বল্‌তে পারলে আমার বুক ফেটে যাবে। কপালে কি আছে জানি না—শেষ-বয়সে হয় ত কবিতা লিখ্‌তেই ব'সে যাবো!

ছেলেবেলায় যখন কলেজে কবিতা পড়েছি, তখন জান্‌তুম, এই কবিতার অর্থ মুখস্থ ক'রে পাশ করবার জন্যই কবিতার সৃষ্টি। কেন যে এত লোক কবিতা লিখেছে, সেকথা তখন মনেই হ'ত না। কোন্ কবিতাকে কোন্ সমালোচক শ্রেষ্ঠ বলেচে, সেইটে স্মরণ রাখাই হচ্ছে দরকার—আমার কাছে কি ভালো লাগে, তার পরীক্ষা তো কোনোদিন করিনি। কিন্তু আজ সেই ছেলেবেলার মুখস্থ কবিতার কয়েকটা লাইন কেবলই মনের মধ্যে গুঞ্জন করছে। মনে হচ্ছে, সে কোনো কবির লেখা কবিতা নয়—যেন আমারই মনের কান্না। আজ যেন মনে হচ্ছে, একটু-একটু বুঝ্‌তে পারছি, কবিরা কতখানি মর্ম্মান্তিক দুঃখে এই সব লিখেছিল। এ তাদের সৌখীনতা নয়, এ তাদেরও প্রাণের কান্না।

কান্না! কান্না! এ কেমনতর কান্না! এ জীবনে অনেক কান্না তো কেঁদেছি। ছেলেবেলায় একবার

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পেরে কেঁদেছিলুম; মনে হয়েছিল, তার চেয়ে বড়কান্না বুঝি পৃথিবীতে নেই! তার পর সংসারের অনেক বিপদে-বিচ্ছেদে, জ্বালাযন্ত্রণায় অনেক কান্না কেঁদেছি—কিন্তু এ কী কান্না! এ কান্নার যে শেষ নেই। এ কান্নার তৃপ্তি যে কান্নাতেই।—না কাঁদ্‌লে কান্নার ক্ষুধা যে মেটাতে পার্‌চি না।

এই তো আমার আনন্দ—এই কান্নাই যে আমার আনন্দ! এক-এক-সময় ভাবি—এ আমার পাগ্‌লামি নয় তো? যা আমি অবহেলার সঙ্গে একদিন ফেলে দিয়েছি, তারই জন্যে কাঁদ্‌চি? যা একদিন আমার কাছে তুচ্ছ ছিল, তাই এখন এমন মহামূল্য হয়ে উঠ্‌ল কি ক'রে? এই মহামূল্যের তো দাম দিইনি, তাই কান্না দিয়ে বুঝি এখন সে-ঋণ শোধ কর্‌চি?

সে যে আমার অত্যন্ত কাছে ছিল; তাই তো কোনো দিন তাকে ভালো ক'রে দেখ্‌তে পাই নি। সে দোষ কি আমার? সে যদি হঠাৎ একদিন প্রভাতে এই বসন্তের নব-মল্লিকার মতো তার সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-আনন্দ নিয়ে আমার চোখের সামনে দক্ষিণা-বাতাসে

ফুটে উঠ্‌ত তা হ'লে নিশ্চয় তার দিকে চেয়ে আমি অবাক্ হয়ে যেতুম—বিস্ময়ে চোখ আমার ফির্‌ত না। সেই হঠাতের ধাক্কায় সেই একটুখানির মধ্যে তার সবটুকু আমার হৃদয় দেখ্‌তে পেত। কিন্তু তা তো হয় নি;—তাকে যে আমি রোজই দেখেছি—কোনো-এক-বিশেষ-মুহূর্ত্তে তো সে আমার চোখের সাম্‌নে আবির্ভূত হয়নি। কবে কখন্ তাকে প্রথম দেখ্‌লুম, তা মনেই পড়ে না—প্রথম-দৃষ্টির কোনো স্মরণ-চিহ্ন তো অঙ্কিত হয়ে নেই!

লতা! লতা—এই নামটি ছেলেবেলা থেকে কতবার কানের আশেপাশে ভেসে-ভেসে চ'লে গেছে—ওর কোনো ঝঙ্কার কোনো দিন একমুহূর্ত্তের জন্যেও কানে বাজেনি। কিন্তু আজ দেখি এ কি? ঐ একটি শব্দ যেন একটি সম্পূর্ণ গান! ওর মধ্যে ছন্দ আছে, সুর আছে, তান-লয় সব আছে। ঐ একটি-কথাতেই আমার হৃদয়ের সব গান যেন গাওয়া হয়ে গেল;—আমার সব কথা যেন বলা হয়ে গেল! আমি যতই বলি, ততই যেন ওর সুর গভীর হয়ে আসে, ততই যেন নূতন নূতন ছন্দে ওর ঝঙ্কার উঠ্‌তে থাকে।

কিন্তু, ছাই, কেন এ সব কথা বল্‌চি? সব কথা তো ঠিক-মতো ক'রে বল্‌বার ক্ষমতা আমার নেই—বলাও যে যায় না। লোকের সহানুভূতি আমি চাই? কি হবে আমার তাতে? কেউ হয় ত বল্‌বে, এ আমার প্রলাপ—তা বলুক-গে!

আজ ইচ্ছে হচ্ছে, লতার সব কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লিখি;—দিনের পর দিন ধ'রে ধ'রে তার সবটা—তার চলা-বলা, খেলা-ধূলা, হাসি-কান্না—মনের উপর ছবির মতো এঁকে নিই। কিন্তু কই কিছুই যে মনে পড়্‌চে না। হায়, কিছুই তো মনে ক'রে রাখি নি! তার দিকে মন দিলুম কবে যে, সে আমার মনে থাক্‌বে? দিনরাত তাকে চোখে-চোখে দেখেছি—মনের কারবার তো তার সঙ্গে কোনো দিন করিনি। মন দিয়ে যে তাকে দেখা যেতে পারত, এ কথা মনে ওঠ্‌বার অবসরই যে পাইনি। ঠিক বল্‌তে পারি না—এখন মনে হচ্ছে, চোখের আড়াল হলে, হয় ত, যাকে দিন-রাত দেখা অভ্যাস হয়ে গেছে, তাকে মনে-মনে না দেখ্‌লে মন খুঁৎখুঁৎ কর্‌তো। কিন্তু সে যে কখনো চোখের আড়াল হোলো না—আমি কি কর্‌ব?

তার সম্বন্ধে দুটি-একটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। একদিন সে আমার হাতের লেখার খাতায় এক দোয়াত কালি উল্‌টে দিয়েছিল। তাতে আমি তাকে খুব মেরেছিলুম। তার সেই ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ এখনও মাঝে-মাঝে বাতাসের ভিতর থেকে কানে এসে লাগে। পরের মেয়েকে মেরেছি ব'লে মায়ের কাছে আমার শাস্তি হ'ল। কিন্তু মায়ের হাতের মার খেয়ে আমি যত কাঁদ্‌লুম, সঙ্গে-সঙ্গে লতাও তত কাঁদ্‌লে। আমার রাগ হ'ল ভয়ানক লতার উপরে! কিন্তু প্রতিশোধ নেবার আর সাহস হ'ল না—কারণ মায়ের হাতের শাস্তির চিহ্ন তখনো আমার গা থেকে মিলোয়নি। আমি রেগে, পড়্‌বার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে রইলুম—লতাকে কাছে আস্‌তে দিলুম না। তার পর, অনেকক্ষণ পরে, ক্ষিধের তাড়নায় যখন ঘরের দরজা খুল্‌লুম, তখন দেখি, চৌকাঠটিতে মাথা রেখে লতা ঘুমিয়ে পড়েছে—চোখের জলের দাগ তখনো তার গালের উপরে আঁকা।

বাবার একটা দামী নতুন ঘড়ি একদিন নেড়ে-

চেড়ে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে আমার হাত থেকে হঠাৎ ফস্কে, ভেঙে চুর্‌মার্‌ হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল লতা; সে তো কেঁদেই ফেল্লে। ভাবনা হ'ল আমার এই লতাকে নিয়ে। আমি যে ঘড়ি ভেঙেছি, এর কোনো প্রমাণ নেই—এক লতা ছাড়া। এক-একবার মনে হচ্ছিল, দোষটা লতার ঘাড়েই চাপিয়ে দিই; কিন্তু জেরায় টিঁকবে কি না সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল। এমনি ক'রে পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে (বোধ হয়, লতার ঘাড়েও দিয়েছি) দুই-একবার ভারি ঠকেছিলুম—শাস্তির পরিমাণ তাতে দ্বিগুণ হয়েছিল। সেই জন্যে লতাকে বল্লুম—"ভাই লতা, লক্ষ্মীটি, কাউকে বলিস্‌নি—বুঝ্‌লি?" লতা সমস্ত-ঘাড়-খানা নেড়ে বল্লে—"না!"

মনে মনে অনেক-দিন ভয় ছিল—বুঝি লতা কথাটা ফাঁশ ক'রে দেয়। আমার মনে যে কী আতঙ্ক ছিল, তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু সেই আতঙ্কের পরিণামের হাত থেকে বাঁচিয়ে লতা আমাকে যে কী নিশ্চিন্ত করেছিল, তা আমি কখনো ভুল্‌তে পার্‌ব না। লতা

বাচাল ছিল বটে, কিন্তু এ-কথা তার মুখ দিয়ে ইহজীবনে বা'র হয়নি। বাবার ধমক-ধামকে সে অনেক সময় অনেক কথা ব'লে ফেলেছে; কিন্তু এর মধ্যে আমার জন্যে শাস্তি আছে ব'লে একথা সে কিছুতেই বলেনি।

আর-একটা কথা মনে পড়্‌চে। কিন্তু এ-কথাটা কেন এখনও ভুলিনি, তা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌চি না। এর মধ্যে কি-এমন ছিল যাতে এটা চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌তে পারে?

লতা তখন ছেলেমানুষটি নয়;—বেশ-একটু বড় হয়েছে। আমি তখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্যে ব্যস্ত। পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমি এক বসন্তের বৈকালে ছাদের এক-কোণে, নিরালায় ব'সে পড়া মুখস্থ কর্‌চি; লতা এক-ছড়া মালা হাতে ক'রে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—"শিরিশ-দা, তোমার জন্যে এইটে গেঁথেছি—নেবে? এই মালা-গাঁথার একটু কায়দা আছে।"—ব'লে সে মালা-গাঁথার প্রকরণ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা সুরু ক'রে দিলে। আমি ধমক দিয়ে উঠ্‌লুম—"চোপ!" আমার কেমন রাগ হচ্ছিল—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলকার উপর সেই রাগ! আমার মনে

হচ্ছিল, পৃথিবীর আর-সবাই বেশ মনের ফূর্ত্তিতে আছে, কেবল একমাত্র আমিই এগ্‌জামিনের দায়ে পড়েছি। ছাদের ঘুল্‌ঘুলি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—দুটো ছেলে মনের আনন্দে মার্ব্বেল খেল্‌ছে; রাস্তা দিয়ে একদল ছেলে হল্লা কর্‌তে-কর্‌তে চলেছে;—মাথার উপর এক ঝাঁক পাখী মনের আনন্দে অবাধে উড়ে চলেছে! আর আমি যেন কেবল একটা গরাদে-দেওয়া খাঁচার ভিতর ব'সে তোতা-পাখীর মতো বইয়ের বুলি আউড়ে যাচ্ছি;—আমার খেল্‌বার যো নেই, আমার কোথাও ছুটে যাবার যো নেই! লতা যখন এসে ছাদে দাঁড়ালো, তখন সঙ্গে ক'রে খাঁচার বাইরেকার একটু হাওয়া যেন নিয়ে এল। তার সেই সমস্ত দেহখানার উপর কোথাও এতটুকু এগ্‌জামিনের ভাবনা নেই। তার সঙ্গেকার সেই একটুখানি হাওয়া, আর তার সেই মনের ফূর্ত্তির আলো পেয়ে আমার মনে হ'ল আমি বাঁচ্‌লুম, কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে একটা হিংসে হ'তে লাগ্‌লো। আমিও তো এমনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌তুম—কিন্তু তা হোলো না কেন? তাই রাগে আমি ধমক্ দিয়ে উঠ্‌লুম—"চোপ!"

লতা আস্তে-আস্তে মালাগাছটি আমার কাছে রেখে চ'লে যেতে লাগ্‌ল। আমি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লুম—"লতা, নিয়ে যাও তোমার মালা!"

লতা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"কেন শিরিশ-দা, রাগ কর্‌চ ভাই? তোমার জন্যে এত ক'রে গাঁথ্‌লুম, নাও না ভাই ওটা।"

আমি বল্লুম—"না না, আমি নেব না। ফুলের গন্ধ নাকে লাগ্‌লে রাত্রে আমার ঘুম হয় না।—এখন এগ্‌জামিনের পড়া!"

লতা কিছু বল্লে না, শুধু একটু হাস্‌লে।

আমার রাগ আরো বেড়ে উঠ্‌ল; আমি মালাগাছটা কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলুম।

মনে হ'ল, লতার মনে একটু ব্যথা লেগেছে। তাতে আমি একটা আনন্দ পেলুম। কেবল আমিই এ জগতে দুঃখ পাব;—আর-কেউ পাবে না?

লতা ছেঁড়া-ফুলগুলোর দিকে জলভরা চোখ দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রইল; তার পর সেগুলো একটি-একটি-ক'রে কুড়িয়ে আঁচল-ভরে নিয়ে গেল।

তার পর যখন পরীক্ষায় পাশ করলুম, বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল পড়ে গেল, তখন লতা বল্লে—"শিরিশ-দা, ইচ্ছে হচ্ছে, আজ একটা ফুলের মুকুট গড়ে তোমার মাথায় পরিয়ে দি।"

কিন্তু সে তা দেয়নি!

লতার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, সেটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। তাদের সঙ্গে আমাদের একটা খুব দূর-আত্মীয়তা আছে বটে, কিন্তু সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আসল-সম্পর্ক লতার মা আর আমার মা দুই সখী। আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতে লতারা থাকৃত—কিন্তু লতা সম্বন্ধে ঠিক করে বলা শক্ত সে কোথায় থাকৃত; কারণ, আমি তো দেখেছি, সে আমার মায়ের কোলে-কোলেই বেড়ে উঠেছে। শুনতে পাই, মায়ের কোল নিয়ে ছেলেবেলায় আমাদের দুজনের ভারি ঝগড়া হ'ত। আমি কিছুতেই কোলের দখল ছাড়তে চাইতুম না। মা তাই বলতেন, ছেলেটা বড় স্বার্থপর! আমরা প্রায় সম-বয়সী; বোধ হয়, লতা বছর-দুয়েকের ছোটো হবে। একসঙ্গে আমরা বরাবরই খেলাধূলা করেছি। মায়ের

আদর আমিও যেমন পেয়েছি, লতাও তেমনি পেয়েছে। বলা বাহুল্য, আমি ছিলুম বাপ-মায়ের সবে-ধন-নীলমণি!

যদিও আমার কাছে কথাটা গোপন রাখ্‌বার চেষ্টা করা হ'ত, তবুও আমি জান্‌তুম, মা সখীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রেখেছেন, লতা তাঁর বৌ হবে। আমি জানি, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী কেউ এলে মা লতাকে দেখিয়ে বল্‌তেন—"এইটি আমার বৌ হবে!" লতার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বল্‌তেন—"দেখ দিকিন্ কেমন বৌ! কেমন টানাটানা চোখ, কেমন বাঁশীর মত নাক"—ইত্যাদি। ব'লে তিনি লতার গালে চুমু খেতেন, তাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে বস্‌তেন।

আমি জান্‌তুম, লতা আমার স্ত্রী হবে; কিন্তু জেনেও কথাটা তেমন ক'রে কখনো তলিয়ে দেখিনি—বোধ হয়, দেখ্‌বার ক্ষমতা আমার ছিল না। তখন কিই-বা আমার বয়েস? আর কিই-বা আমার জ্ঞান? লতাকে গোড়া থেকে যেমন ক'রে দেখে আস্‌ছি, বরাবর তেমনি করেই তাকে দেখ্‌তুম—তার যে অন্য রূপ থাক্‌তে পারে, এ আমার কল্পনায় কখনো আসেনি। বোধ হয়, কল্পনা-

জিনিসটা আমার ধাতে ছিল না। এখন ভেবে দেখ্ছি লতাকে আমি মনে-মনে হিংসা করতুম। মা যে বল্তেন আমি স্বার্থপর—কথাটা একেবারে মিছে নয়। আমার বেশ মনে পড়্ছে ছেলেবেলায় আমার পাণ-থেকে-চুণটুকু-খস্‌বার জো ছিল না। আমি সব নেব—আমি সব খাব—এই ছিল আমার ছেলেবেলাকার বুলি!' লতা যে মায়ের স্নেহ দখল ক'রে বসেছিল, এর জন্যে লতাকে বোধ হয়, আমি ভালো চোখ দিয়ে কখনো দেখ্‌তে পারিনি। কিন্তু এও আবার বলি, আমার বেশ মনে পড়্ছে, লতার একবার শক্ত অসুখ হতে সবাই যখন বল্‌তে লাগ্‌লো আহা, লতা বুঝি বাঁচে না! তখন আমার সত্যি কান্না পেয়েছিল।

একধরণের মানুষ পৃথিবীতে আছে, যারা একেবারে নীরস—কাঠের মত-নীরস—কাঠখোট্টা। আমি অনেকটা সেই ধরণের মানুষ। কিন্তু আমার মধ্যে কোথাও বোধ হয় রসের একটি ক্ষীণধারা গোপন ছিল, নইলে কেমন ক'রে কোথাকার একটা অজানা বাতাসের শিহরণে একমুহূর্ত্তে এমনতর পুষ্পভূষিত হয়ে উঠ্‌লুম!

মণি-প্রদীপ

ছেলেবেলা থেকে এ জগৎ-সংসারটার উপর আমার কি ধারণা ছিল? এ বড় শক্ত ঠাঁই! কেবল প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা—মারামারি' কাটাকাটি ক'রে সাফল্যের নিশান যে কেড়ে নিতে পারে, তারই জয়—সেই সত্যকার বীর! এই যুদ্ধের জন্য আমি বরাবর তৈরি হয়েছি এবং আমাকে তৈরি করা হয়েছে। এরই মন্ত্র আমার পড়া-মুখস্থর সঙ্গে-সঙ্গে আমার কানে ফুঁকে দেওয়া হয়েছে—আমি ভক্তিভরে সেই মন্ত্র জপ করেছি। এই সংসারের গোপন বিজনতার অন্তরে প্রেম, স্নেহ, ভালোবাসার যে পুণ্য মন্দাকিনী-স্রোত বহে চলেছে, তাতে অবগাহন ক'রে মানুষ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে ওঠে—এ সত্য তো আমি জানতুম না বল্লেই হয়। জানতুম, সে শুধু কল্পনা—অলস কবির স্বপ্ন মাত্র। জানতুম, সে মায়াবী—তাই ভয়ে তার দিকে কখনো চাইনি। কিন্তু কি লাভ করেছি? বহু আস্ফালন ক'রে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলুম, এই জীবন-সাগর মন্থন ক'রে কি সুধা উঠল? একশত-টাকার কেরাণিগিরি বই ত নয়!

যাক্ ও সব কথা!

আমি যেম্‌নি এণ্টান্স পাশ কর্‌লুম, মা ধ'রে বস্‌লেন, বিয়ে কর্‌তে হবে। তাঁর অত্যন্ত তাড়া। তাঁর তাড়ার কারণ এই যে, লতা বড় হয়ে উঠেছে।

আমি মাকে বল্‌লুম—"তা হবে না।"

মা বল্লেন—"কেন রে?"

আমি তখন সেই-বয়সেই বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছি। আমি বল্লুম—"আমায় এখন জীবনযুদ্ধে প্রস্তুত হ'তে হচ্ছে, আমার এখন স্বচ্ছন্দ অবাধ গতি চাই—এ সময় আমার পিঠে গুরুভার চাপিয়ে যদি আমায় পঙ্গু ক'রে দাও, তা হ'লে চিরজীবন অকর্ম্মণ্য হয়ে কেবল পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করতে থাকব"—ইত্যাদি।

কথাগুলা ঠিক আমার রচনা নয়। তখন পড়া মুখস্থ ক'রে ক'রে এমন অসাধারণ স্মরণ-শক্তি জন্মে গিয়েছিল যে, যা শুন্‌তুম, তাই মুখস্থ হয়ে যেত। কথাগুলি আমাদের এক প্রসিদ্ধ দেশনায়কের বক্তৃতার মুখে শুনেছিলুম এবং সেই বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে আমরা বিস্তর ছাত্র—উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিবাহ করব না—এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলুম। বাঙালীর একটা নিন্দা

শুনতুম, বাঙালী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না। সেই জন্যে আমার জেদ ছিল, বাঙালীর এই কলঙ্ক মোচন আমি করব। সেই জন্যে মায়ের প্রস্তাবে জোরের সঙ্গে বলতে হ'ল—"না !"

মা সব কথা বুঝ্‌লেন কি না, জানি না ; তবে তিনি এইটুকু বেশ বুঝ্‌লেন যে, আমি বিয়ে করতে চাই না।

মা ভয়-খেয়ে গেলেন ; বুঝলুম, তাঁর খুব ইচ্ছে, কিন্তু বেশী পীড়াপীড়ি করতে তাঁর সাহস হচ্ছে না। আমার ন-মামাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিইয়ে ভারি একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে। মায়ের সেই জন্য ভয় আছে। 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ।'

মায়ের অনেক দিনের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হচ্ছে, তিনি আশা ছেড়েও ছাড়তে পারছেন না। একদিন তিনি এসে বল্লেন—"শিরিশ, তুই কি সত্যি বিয়ে করবি না ?"

আমি বল্লুম—"কে বল্লে করব না ? তবে এখন নয়। আগে টাকা রোজগার করি, তবে।"

মা বল্লেন—"আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তুই অনেক টাকা রোজগার কর্‌বি। বলিস্ তো বিয়ের ঠিক করি।"

আমি বল্লুম—"মা, তুমি ঠিক বুঝ্‌ছ না!" বলেই আবার সেই জীবন-যুদ্ধের মুখস্থ বুলিটা আউড়ে গেলুম।

মা কথাটা বুঝ্‌লেন না বলেই তাঁর ভয় আরো ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ল।

সেই সময় দেখ্‌তুম, মা লতাকে কাছে-কাছে রেখে কেবলই তার মুখে মাথায় হাত দিচ্ছেন। এক-এক-সময় তাঁর চোখে জল এসে পড়্‌ত।

মা লতার মা-বাপকে আশ্বাস দিতেন—আরো কিছু দিন রাখো—লতাকে আমি বৌ কর্‌বই। কিন্তু লতার বাপ-মার সাহস হ'ল না। মেয়ে বড় হয়েছে ব'লে ইতি-মধ্যেই নিন্দে উঠেছে। শেষে আরো বড় কর্‌লে হয় ত বিয়েই হবে না।

লতার বিয়ে হয়ে গেল।

পশ্চিমে চাকরী করে, এমন-একটি ছেলের সঙ্গে লতার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পরই লতা যে-দিন শ্বশুরঘর করতে গেল, আমি সে দিন বার্ষিক-পরীক্ষার পড়ায় ব্যস্ত। লতা তার স্বামীর সঙ্গে আমার পড়ার ঘরে ঘোমটা-মুখে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াল। তার পর, আমাকে একটি প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। মনে হ'ল, সে যেন একবার চোখ মুছ্‌লে। আমি বইয়ের উপর আবার দৃষ্টি ফেরালুম।

তার সেই বিদায়-বেলাকার মুখখানি আমার দেখা হয়নি।

এখন ভাব্‌ছি, সেই তুচ্ছ প্রতিজ্ঞা-পত্রখানার কথা। যে একটুকরা কাগজ কুটিকুটি ক'রে এক-ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়—সেই কাগজের টুকরো জগদ্দল-পাথরের মতো আমার বুকে চেপে ব'সে রইল! আর ভাব্‌চি বাঙালীর কলঙ্ক-মোচন! কলঙ্ক-মোচন তো করেছি—কিন্তু কারুর মনের কোণেও কি তার গৌরব রেখা-পাত করেছে? মহা আস্ফালন, মহা লম্ফ-ঝম্প ক'রে তো জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলুম, কিন্তু কী জয় ক'রে ফিরেছি?—এই একশত টাকার রাজত্ব? আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপমারা কাগজের মুকুট?

আর বেশী-কিছু বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে না। এতক্ষণ যা বল্‌ছিলুম, তার সাম্‌নে লতা ছিল; সে এতক্ষণ আমার আশপাশের আকাশ-বাতাস পূর্ণ ক'রে আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ছিল—আমি তারই উৎসাহে বলে যাচ্ছিলুম। কিন্তু যেম্‌নি তার বিদায়-গান গেয়েছি, অমনি মনে হচ্ছে আমার-সমস্ত যেন শূন্য হয়ে গেছে। সে বিদায় নিয়েছে। আমার মন নিভে আস্‌ছে। আর কিছু বল্‌তে পার্‌ছি না।

কিন্তু বল্‌তেই তো হবে। বল্‌ব আর কি? এক-কথায় সবটা বলা হয়ে যায়। লতা চ'লে যাবার পর থেকে খুব-কসে পড়া মুখস্থ করেছি আর পাশ করেছি। বইয়ের পাতা থেকে কখনো মুখ তুলে চাইনি। এত বড় বিশ্ব-সংসারটাকে বইয়ের পাতার আড়াল দিয়ে ঢেকে রেখে-ছিলুম। ব্যস্‌, এই তো করেছি! তার পর পয়সার ধাক্কায় ঘুরেচি। অনেক আশা করেছিলুম; ভেবেছিলুম, না জানি, কত বড় দিগ্‌গজ আমি! কিন্তু সংসারে বেরিয়ে দেখ্‌লুম, ঘা-খেয়ে-খেয়ে বুঝ্‌লুম—কতটুকু আমি! আর কোথায় রইল বা আমার আশা!

একশত টাকার রাজস্ব যখন এল, তখন রাণীই বা না আস্‌বেন কেন? বলা বাহুল্য, এই রাজত্ব-লাভের সঙ্গে রাজকন্যাটিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু সে-সব কথা তুলে নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ কি?

বিয়ে হ'ল আমার মাঘ মাসের মাঝামাঝি। এর মধ্যে বল্‌বার কথা কিছুই নেই। সংসার-ধর্ম্মের একটা অবশ্যকর্ত্তব্য এই বিবাহ—আমি যখন সংসারী জীব—সন্ন্যাসী বৈরাগী নই, তখন বিয়ে তো আমায় কর্‌তেই হবে—এবং কর্‌লুমও তাই। তাই ব'লে এটাকে যে একেবারে অবহেলা ক'রে ব'সে রইলুম, তা নয়। সব জিনিসকেই আমার সোজাসুজি দেখা অভ্যাস—এই বিবাহের মধ্যে যেটা সব-চেয়ে সোজা কথা অর্থাৎ সুখে-স্বচ্ছন্দে কি করে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তার উপায়ই বা কি এবং কোথাই বা তার গলদ থাকৃতে পারে, মনে-মনে তাই নিয়ে এমন আলোচনা কর্‌তে লাগ্‌লুম যে পত্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ কর্‌বার অবসরই রইল না।···

এতদিন পড়াশুনার চাপে, এবং চাকরীর ধাক্কায় পড়ে লতার কথা আমার মনেই পড়্‌ত না। কিন্তু আমাদের

বাড়ী কি তাকে ভুলে ছিল? তার স্মৃতি কি আমার চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল না? সত্যি কি সে আমার মন থেকে মুছে যেতে পেরেছিল?...

লতা আমার বিয়েতে আস্‌তে পারেনি, তাই নিয়ে মা ভারি দুঃখ কর্‌ছিলেন। বল্‌ছিলেন, লতাকে কদ্দিন দেখিনি।

* * * *

মায়ের একটা পোষা পাখী ছিল। তিনি যেমন ক'রে 'লতা লতা' ব'লে ডাক্‌তেন, পাখীটা ঠিক তার অনুকরণ কর্‌তে শিখেছিল। অনেক দিন তার ডাক কানে আসেনি। আজ হঠাৎ শুন্‌লুম, সে 'লতা! লতা!' ক'রে চীৎকার কর্‌ছে।

* * * *

লেখাপড়ার পালা তো চুকে গেছে। পড়ার টেবিলের ভিতরে কতদিনকার চোতা কাগজ জমে রয়েছে। অনেক দিন থেকে ভাব্‌ছি সাফ ক'রে ফেল্‌বো। আজ হাতে কাজ নেই—ছেঁড়া কাগজ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে লতার ছেলেবেলাকার হাতের লেখার খাতা একখানা বেরিয়ে পড়্‌ল।

*　　*　　*　　*

কতদিন আগে একটা টক্‌টকে লাল-রঙে হাত ডুবিয়ে লতা পথের ঘরের দেয়ালে পাঁচ-আঙুলের ছাপ দিয়েছিল। বাড়ীর ভিতর আস্‌তে আজ হঠাৎ দেখি, সে দাগ এখনো জলজ্বল কর্‌ছে।

*　　*　　*　　*

মাঘের মাঝামাঝি আমার বিয়ে হ'ল। ফাল্গুনের প্রথমেই দেখি লতা এসে হাজির। সে বল্লে, "ভারি দুঃখ, শিরিশ-দার বিয়েতে আস্‌তে পার্‌লুম না, এমন ঝঞ্ঝাটে পড়্‌লুম! কৈ, দেখি কেমন শিরিশদার বৌ?"

এ কথা আমার সাম্‌নে হয়নি—আমি তখন আপিসে ছিলুম। মায়ের মুখে শুন্‌লুম।

আপিস থেকে ফিরে বৈকালে ছাদে বসে জলযোগের ব্যবস্থা কর্‌ছি, লতা আমার স্ত্রীর হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে এসে উপস্থিত হ'ল। এক-ঝট্‌কা বসন্তের বাতাস, একরাশ ফুলের গন্ধ নিয়ে এসে বল্লে—"কি শিরিশ-দা, চিন্‌তে পার?"

বাস্তবিকই আমি তাকে চিন্‌তে পার্‌লুম না।

এই লতা!

তার দিকে চেয়ে মনে হ'ল, এই যেন তাকে প্রথম দেখ্‌লুম। এই প্রথম-পরিচয়।

লতা, আমাকে অবাক্ দেখে বল্লে—"সে কি দাদা! বৌ পেয়ে ভুলে গেলে বুঝি?"

আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌লুম? আমি কী দেখলুম? এ কি কোন্ মায়াবী আমার চোখে মায়া-অঞ্জন লাগিয়ে দিয়ে গেল?

এই লতা! এ মূর্ত্তি তো আগে কখনো দেখিনি!

এ যে সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্যের আনন্দ জড়ো ক'রে রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে।

এ কি লতা? এই কি আমার ছেলেখেলার সঙ্গী সেই লতা?

লতা কি বল্‌ছিল, আমি শুন্‌তে পাই নি, হঠাৎ তার হাসি শুন্‌লুম—মনে হ'ল, সেই হাসিতে সমস্ত বিশ্ব যেন ঝরে পড়ল!

লতা বল্লে—"দাদা, আজ সমস্ত দিন ধ'রে তোমাদের জন্যে এই মালা গেঁথেছি—তোমাদের ফুলশয্যায় আমার ফুল দেওয়া হয়নি। এই নাও সেই ফুল।"—ব'লে

প্রথমে আমার স্ত্রীর গলায় সে একছড়া মালা পরিয়ে দিলে; তার পর আমার গলায় পরিয়ে দিতে এসে বল্লে—"দাদা, আজ যদি ফুলের গন্ধে রাত্রে তোমার ঘুম না হয়, তাহ'লে আজ আর আমার উপর তোমার রাগ হবে না; খুসীই হবে জানি।"—ব'লে সে আমার গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

সেই মালার দিকে চেয়ে আমার চোখে যেন কেমনতর একটা স্বপ্নের আবেশ এসে লাগল; আমি ধীরে ধীরে মালাটী খুলে লতাকে পরিয়ে দিতে গেলুম।

লতা স'রে দাঁড়াল; বল্লে—"ছি দাদা, তোমার গলার মালা কি আমার পর্‌তে আছে?"

আমি থম্‌কে তার চোখের দিকে চেয়ে রইলুম, লতাও আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল। তার পর হঠাৎ তার ভারি-ভারি চোখদুটি নামিয়ে সে একবার চট্‌ ক'রে চ'লে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে আবার গল্প জুড়ে দিলে। আমি যেন কেমনতর হয়ে গেলুম।

* * * *

আমার জীবনে এই একটি মুহূর্ত্তের বসন্ত! কিন্তু

ভাবি এই একটা-মুহূর্ত্তই বা কা'র জীবনে ক'বার আসে? আমার সমস্ত জীবনখানার উপরে এই যে একটি মুহূর্ত্ত জেগে আছে—এ যে আমার জীবনের মণি-প্রদীপ!

আর সেই বাসন্তীর দান?—সেই ফুলের মালা? সে তো কৌটোর ভিতর থেকে শুকিয়ে ধুলো হয়ে কবে এক বৈশাখীর ঝড়ে উড়ে গেছে, কিন্তু তার সৌরভ আজও আমার প্রাণের অলিগলির মধ্যে ঘুরে-ঘুরে ফিরচে!

অভিষেক

১

সে ছিল একেবারে কালো কুরূপ;—মানুষের অমন ভয়ানক চেহারা কেউ কখনো দেখেনি। দেশের লোক তার দিকে ফিরে চাইতে পারৃত না—সাম্‌নে পড়্‌লে মুখ-ফিরিয়ে চ'লে যেত। উৎসবের দিন তার ডাক ত পড়্‌তই না,—বিপদের সময়েও কেউ তার কথা মনের কোণেও আন্‌ত না।

অভিষেক

সে ছিল একলা ;—সঙ্গের সঙ্গী, আলাপের বন্ধু কেউ তার ছিল না। তার সঙ্গে কেউ হেসেও কথা কইত না, তাকে তিরস্কারও করত না। সে তার সেই কালো-রূপের অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন তলিয়ে থাকত।

কিন্তু কেউ যদি ভালো ক'রে তাকে দেখ্‌ত, তা হলে দেখ্‌তে পেত, তার সেই কালো-কাজল রঙের উপরে একটি বিদ্যুতের আভা থেকে-থেকে খেলে যায়; তার সেই কুৎসিত মুখের উপরে সময়-সময় এমন হাসি ফুটে ওঠে—যার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যায় না; আর সেই গোল-গোল ভাঁটার মতন চোখের ভিতর থেকে কি-একটা কাঁপুনি উঠ্‌তে থাকে যাতে মনে হয় যেন তার ভিতরের একটা আলো বাইরের কালো পর্দ্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে আস্‌বার জন্যে আকুলিব্যাকুলি করছে।

কিন্তু কে তার ভিতরের খবর রাখে! বাইরের বাধায় সকলকার মন ফিরে-ফিরে যায়—কালোর বুকের ভিতরে যে আলো জ্বলছে, কেউ তার সন্ধানই পায় না। সবাই তাকে অপমানে, তাচ্ছিল্যে, অনাদরে দূর থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

সে আপন-মনে নদীর বিজন তীরটিতে গিয়ে বসে;—তার মনের যত কান্না সুর দিয়ে গেঁথে একলাটি গেয়ে যায়—কেউ তা কাণ-পেতে শোনে না; কেবল বনের পাখী হঠাৎ-কখনো সেই সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে ওঠে।

২

রাজা এক মহা সভা আহ্বান করলেন। সে সভায় এলেন দেশের যত ধনবান্, জ্ঞানবান্, যত বুদ্ধিমান্, যত পণ্ডিত, যত কবি, যত বাউল। ধনবান এসে রাজার পায়ে ধন-দৌলত উপহার দিলেন; জ্ঞানবান্ এসে গভীর তত্ত্ব-কথা শোনালেন; বুদ্ধিমান্ এসে রাজাকে সৎ-পরামর্শ দিলেন; পণ্ডিত শাস্ত্রীয় তর্ক তুললেন আর কবিরা শ্লোক শোনাতে লাগ্‌লেন। সব-শেষে বাউলের গান হ'ল। দেশের যত লোক সবাই আজ এসে সভায় উপস্থিত। আসেনি কেবল একটি লোক—সেই কালো। কেউ তার খবরও করেনি।

ধনীদের মণিমাণিক্যে দর্শকের চোখ ঝল্‌সে যেতে

লাগ্‌ল, জ্ঞানবান্‌ বুদ্ধিমান্‌দের কথায় ঘমকে চমক লাগ্‌তে লাগ্‌ল, পণ্ডিতের তর্কে জটিল কথা যতই জটিল হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, ততই বাহবা পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার পর কবিরা একে-একে যখন শ্লোক শোনাতে লাগ্‌লেন —কেউ প্রভাত বর্ণন, কেউ সন্ধ্যা বর্ণন, কেউ বিরহ, কেউ মিলনের কাহিনী শোনালেন, তখন চারিদিকে ধন্য-ধন্য রব প'ড়ে গেল। কে যে বড়, কে যে ছোটো, মীমাংসা করা শক্ত হয়ে উঠ্‌ল। সবাই বল্‌তে লাগ্‌ল, আশ্চর্য্য কথার বাঁধুনি!—এ ত শ্লোক নয়, এ যেন তুবড়ি-বাজির ফুলঝুরি! এমন অদ্ভুত শব্দ-চয়ন, কথার এমন আশ্চর্য্য কারসাজি ত কোথাও দেখিনি। এমন অপরূপ বাহাদুরী কে দেখাতে পারে!

৩

একে-একে কবিদের শ্লোক শোনানো শেষ হ'ল। বিচারকের দল বিচার ক'রে পুরস্কার ঘোষণা কর্‌লেন। সভা প্রায় ভাঙে-ভাঙে, এমন সময় হঠাৎ একটা গোল-মালে চারিদিকের লোক চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। দেখা গেল,

সেই কালো ভিড়-ঠেলে প্রবেশ কর্‌ছে। আজকের সভায় কারো আসার মানা নেই—রাজার হুকুম! কাজেই পথ ছেড়ে দিতে হ'ল।

সে এসে একেবারে সিংহাসনের সুমুখে দাঁড়াল। সভাশুদ্ধ সকলে মুখ বিকৃত কর্‌লে।

মন্ত্রী বল্লে—"কি চাও তুমি?"

সে মহারাজের দিকে চেয়ে বল্লে—"মহারাজ, আজকের দিনে দেশের লোক আপনার পায়ে যার যা ভালো, তাই দিতে এসেছে। আমিও আপনার প্রজা—আমিও কিছু দেব।"

রাজা বল্লেন—"কি দেবে তুমি?"

সে বল্লে—"মহারাজ, আমার মাত্র একটি সম্পদ্ আছে, তাই আপনাকে নিবেদন কর্‌ব।"

রাজা বল্লেন—"কি দেবে, বল।"

সে বল্লে—"মহারাজ, আমার কান্না।"

কান্না! সভাশুদ্ধ সবাই হেসে উঠ্‌ল। চারিদিক্ থেকে টিটকারি পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে অচল, অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা হেসে বল্লেন—"আচ্ছা, বেশ, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলুম।"

সবাই অবাক্। যাকে দেশের লোক অবজ্ঞা করে, দেশের রাজা তাকে আদর দিলেন? কেউ দিলে ধন-রত্ন, কেউ দিলে জ্ঞান-রত্ন, কেউ দিলে কাব্য-রত্ন, তারই সঙ্গে কি-না কান্নাও রাজার গ্রাহ্য হ'ল! সবাই চোখ-টেপাটেপি করতে লাগ্‌ল।

কাপড়ের ভিতর থেকে একটি একতারা বা'র ক'রে—তার সেই একটি তারের উপরে বরাবর সে ঘা দিতে লাগ্‌ল। অতি ক্ষীণ তার সুর—কানে লাগে-কি না-লাগে। বাইরে তার জোর নেই, কিন্তু বুকের ভিতরে গিয়ে তা কাঁপ্‌তে থাকে। এমন মৃদু তার ধ্বনি যে, সবাইয়ের কানে তা প্রবেশই করলে না;—কেউ শুন্‌তে পেলে কি না, তাও বোঝা গেল না। সকলের মুখে একটা অবজ্ঞার চাঞ্চল্য দেখা গেল। রাজা পাথরের মূর্ত্তির মতন স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন;—সুরের ঘায়ে তাঁর চোখের পাতা কেবল কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

তার পর, রাজার দিকে মুখ ক'রে সে গান আরম্ভ

করলে—নিজের দুঃখের কান্না সুর দিয়ে বেঁধে সেই গান তৈরি। অনেকে নাক-সিঁটকে বল্লে—'ওর কান্না আবার শুনব কি।' ব'লে তারা রহস্যালাপে মন দিলে। সে কিন্তু চোখ বুজে গেয়ে যেতে লাগ্‌ল। সেই গান তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আকাশের উপর ছড়িয়ে গেল; —সমস্ত সভাকে পরিপূর্ণ ক'রে বহে যেতে লাগ্‌ল। সেই সুর কখনো কণ্ঠের সীমা অতিক্রম ক'রে আকাশের দিকে আলোর মতন ছুটে গেল; কখনো বুকের মধ্যে বদ্ধ হয়ে গুমরাতে লাগ্‌ল; কখনো চলার আনন্দে তালে-তালে নৃত্য করতে লাগ্‌ল; কখনো কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটবার বেদনায় কাতরাতে লাগ্‌ল। কেউ তা শুন্‌লে, কেউ শুন্‌লে না—কেউ বুঝ্‌লে, কেউ বুঝ্‌লে না। যে দু-একটি লোক শুন্‌লে, বুঝ্‌লে, তাদের মনে হ'ল, তাদের বুকের ভিতরকার কোন্ তারে যেন ঘা পড়েছে—সেখান থেকে ঠিক অমনিতর একটা সুর বেজে-বেজে উঠ্‌ছে;—সেই কালো যা গাইছে, সে যেন তারই নিজের হৃদয়ের ব্যথা! কেউ-কেউ আশ্চর্য হ'ল, কেমন ক'রে ঐ গায়ক তার গোপন মনের কথাটি জান্‌লে! কেউ

অবাক্ হ'ল, যে-কথা বল্‌বার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না, কেমন ক'রে সেই কথা ও বল্লে! অবাক্ হ'ল, আশ্চর্য্য হ'ল অতি অল্পই লোক,—অধিকাংশ লোকই মনে-মনে হাস্‌তে লাগ্‌ল। রাজার ভয়ে তারা চুপ ক'রে ছিল—নইলে কালোর লাঞ্ছনার আজ অন্ত থাকৃত না।

কালো তার গান শেষ ক'রে চোখ খুলে দাঁড়াল। কোথাও একটা বাহবা শোনা গেল না;—কেবল নিশ্বাসের মত অস্ফুট একটি মৃদু গুঞ্জন উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই কোলাহলের মধ্যে চাপা প'ড়ে গেল। রাজা বল্লেন—"কবি!—" বল্‌তে বল্‌তে তাঁর গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল।

"কবি!"—সভার মধ্যে একটা টিটকারির রোল প'ড়ে গেল। রাজার আজ হ'ল কি! কেউ অগ্নিশর্ম্মা হয়ে আস্ফালন কর্‌লেন; কেউ রসিকতার তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

রাজা বল্লেন—"কবি! তোমার গানে আমি মুগ্ধ হয়েছি—কিন্তু তুমি বড় অসময়ে এসেছ, আজকের

সভায় কবির পুরস্কার দেওয়া হয়ে গেছে। এখন তোমায় কি দিই ?”

সে বল্লে—“মহারাজ, ক্ষোভ কর্‌বেন না ;—পুরস্কার আমি পেয়েছি।”

—“কৈ কবি ?”

—“ঐ ত মহারাজ, আপনার চোখের জল এখনো শুকোয়নি—ঐ ত আমার পুরস্কার।”

রাজা বল্লেন—“ধন্য ধন্য—কবি! এস তোমায় আলিঙ্গন করি।”

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বুদ্ধিমান্ ব’লে উঠ্‌লেন—“রাজার যেরূপ বুদ্ধির বিকাশ দেখা যাচ্ছে, তাতে ঐ গবুচন্দ্র মন্ত্রীই ওঁর মানাবে ভালো।” এক কবি বল্লেন—বৃথা এতকাল অরসিকের কাছে রস নিবেদন করেছি।” এক পণ্ডিত বল্লেন—“কাব্য-সুন্দরী দেখ্‌ছি আজ অলঙ্কার খুলে বিধবা হলেন!” ব’লে একে-একে সব চ’লে যেতে লাগ্‌লেন। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সভা প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

তখন রাজা বল্লেন—“কবি! আমার এই সামান্য চোখের জলে তোমার তৃপ্তি হ’ল ?”

—"হ'ল বৈ কি মহারাজ!"

অমনি এক-কোণ থেকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"কবি, এই দেখ, আমাদেরও চোখের জল তোমার অভিষেকে দিয়েছি।"

কবি বল্লে—"ধন্য আমি।"

উপদেশের তাড়স্

ব্যাপারটা খুবই সামান্য, কিন্তু তার হুল-ফোটানোর দাগ এখনো আমার মনের উপর দগ্-দগ্ করছে।

এন্‌জিনিয়ারিং কালেজ থেকে বেরিয়েই এক চাকরী পেলুম—বিদেশে। একটা নতুন রেলওয়ে-লাইন খোলা হচ্ছিল, তারই একটা কাজ।

আমি খাঁটি সহুরে ছেলে; এ-পর্য্যন্ত এক শিবপুর ছাড়া বিদেশ কাকে বলে, জানি না। বিদেশের নামে উৎসাহে বুকটা যেমন লাফিয়ে উঠ্‌ল, তেমনি আবার ভিতরে-ভিতরে কেমন গা-ছম্‌ছম্‌ও করতে লাগ্‌ল।

অজানার প্রতি মানুষের যেমন টানও আছে, তেমনি ভয়ও আছে। ঐ ছুটো দৈত্যকে বুকের মধ্যে পুরে নিয়ে আমি বাড়ী-ছেড়ে রওনা হলুম।

রেলগাড়ীতে অনেকগুলি ভদ্রলোককে দেখ্‌লুম। তার মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ। আমি তাঁকে চিনি না; কিন্তু আমি গাড়ীতে উঠ্‌তেই তিনি অতি-পরিচিতের মতো ব'লে উঠ্‌লেন—"এস ভাই, এস!"—ব'লে হাত ধ'রে পাশে বসালেন। লোকটি বোধ হয় ঘটক হবেন। কারণ, নানারকম কৌশলে তিনি কেবলই এই খবরটা জান্‌তে চাইছিলেন যে, আমি-লোকটা বিবাহিত কি-না? যেমন ফাঁস হয়ে গেল যে, আমার বিয়ের ফুল তখনো ফোটেনি, অমনি আমার কানের পাশে ঐ মধুকরটির গুঞ্জন রীতিমত জমে উঠ্‌ল। তিনি বোধ হয়, আমার আগাগোড়া পরিচয়টা মুখস্থ ক'রে নিচ্ছিলেন। কারণ, কথার মধ্যে তিনি প্রায়ই হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে উঠ্‌ছিলেন—"কি বল্লে তোমার বাপের নাম ভাই?—অমুক—না? তোমাদের বাড়ী অমুক জায়গায়?—না?" ইত্যাদি।

উপদেশের তাড়স্

রেলগাড়ীর সঙ্গী-হিসেবে লোকটিকে আমার নৈহাৎ মন্দ লাগ্‌ছিল না;—তাঁর মধ্যে ভারি একটি মজা ছিল। তিনি এই অল্প-সময়ের মধ্যে আমার সঙ্গে এতটা মাখামাখি ক'রে নিলেন যে, ওরই মধ্যে আমার উপর তাঁর দু-একবার মান-অভিমানও হয়ে গেল। ইনি নিশ্চয় সেই দলের লোক, পরের প্রতি যাদের দরদ অতিমাত্রায় অতিরিক্ত,—তুমি চাও বা না-চাও গায়ে-পড়ে তোমার উপকার এরা কর্‌বেই। আমি এ'কে একলা, তায় এই প্রথম বিদেশ যাচ্ছি, শুনে তাঁর মহা চিন্তা উপস্থিত হ'ল। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—"তাই ত হে, তুমি একলা যাচ্ছ, আমার ভাবনা হচ্ছে। তোমাকে সঙ্গে করে আমি নিশ্চয় পৌছে দিয়ে আস্‌তুম, হায়-হায়, যদি না—"

আমি যে-রকম ভালোমানুষ এবং আন্‌কোরা লোক, তাতে বিদেশে গিয়ে যে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাব, সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। সেই জন্যে বিদেশে যেতে হ'লে কি-কি জিনিস জানতে হয় এবং কোন্‌-কোন্‌ বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার, সে-সম্বন্ধে তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে আমায় চিবিয়ে-চিবিয়ে উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন।

তার মধ্যে যেটা তাঁর বিবেচনায় সবচেয়ে অমূল্য কথা, সেটা হচ্ছে বিদেশে কি-করে চোর-ডাকাত চিনে নিতে হয়, তারই তত্ত্ব। তাঁর ঐ অমূল্য তত্ত্বের অধিকাংশই আমার মন-থেকে এখন মুছে গেছে, নইলে জগতের হিতার্থে আজ সেগুলোকে আমি প্রচার ক'রে দিতে পারতুম। তাঁর দেওয়া আর-একটি জিনিষও আমি হারিয়ে ফেলেছি সেটা হচ্চে সেই আশ্চর্য্য কষ্টিপাথর—যার উপর মানুষকে কষে নিয়ে আবিষ্কার করা যায়, তার চোরত্ব কতটুকু।

এ সব জিনিস খুইয়ে ফেল্লেও তাঁর কথার এই সার-টুকু আমার মনে আছে যে, আমরা স্বদেশী চোরদের মুখ-চেনা ব'লে আমাদের প্রতি তাদের একটা চক্ষুলজ্জা আছে; কিন্তু বিদেশী-চোরদের তো তা নেই, সেই জন্যে বিদেশে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। আমার মনে পড়্‌ছে, তিনি এ-কথাও বলেছিলেন যে, কেন তা বলা যায় না বটে, কিন্তু বিদেশের লোকমাত্রেই হয় চোর, না-হয় ডাকাত! সাধুলোক সেখানে দুর্লভ। তাঁর এই মতটিকে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্যে অভিজ্ঞতার থলি ঝেড়ে তিনি অনেক গল্প বা'র কর্‌তে লাগ্‌লেন। শেষে

হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লেন যে, তিনি এত চালাক যে, আমাকেই তিনি একজন মস্ত ধড়িবাজ চোর ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য পরীক্ষা ক'রে বুঝ্‌লেন বটে যে, তা নয়।

তিনি এত চোরের গল্প জানেন যে শুন্‌লে মনে হয়, লোকটা যেন "দারোগার দপ্তর" গ্রন্থাবলী আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে রেখেছে। চোর-ডাকাতের হাতে মানুষের কতরকম বিপদ্ এবং লাঞ্ছনা ঘটেছে ও ভবিষ্যতে ঘট্‌তে পারে, তার একটা বিশদ তালিকা তিনি মুখে-মুখে তৈরি ক'রে ফেল্লেন। আমার পিঠে আঙুলের একটা ঠেলা দিয়া বল্লেন—"নোট্‌বুকে টুকে রাখ হে! অনেক কাজে লাগ্‌বে।" আমি রাজি হলুম না দেখে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বল্লেন—"আচ্ছা, মনে-করে রাখ্‌লেও চল্‌বে।"

শেষে তাঁর এই একঘেয়ে চোরের কাহিনীতে গাড়ীর সমস্ত বাতাস যেন ঘুলিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল এবং চৌরতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশের ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ল। আমি তাঁর কাছ থেকে স'রে পড়্‌বার জন্যে উশ্‌খুশ্‌ কর্‌তে লাগ্‌লুম। তাই দেখে তিনি আমার হাত-

খানি মুখ বা'র ক'রে বল্লেন—"ইস্! এ যে একেবারে বনালয় দেখ্ছি!"

আমার বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্ল। বিদেশ বল্‌তে মনের মধ্যে যে স্বপ্নরাজ্য গড়ে রেখেছিলুম, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেটা চুর্‌মার্ হয়ে গেল। আমার মনে হ'তে লাগ্ল, এ যেন কোন্ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ কর্‌তে এলুম! গাড়ী ছাড়্বার সময় বুড়োটি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লেন—"সাবধান! এখানে নিশ্চয় চোর-ডাকাত আছে!"

তাঁর এই কথা শোন্‌বামাত্র নিজেকে এমন একলা ও অসহায় মনে হ'তে লাগ্ল যে, আমি চারিদিক্ শূন্য দেখ্‌তে লাগ্‌লুম। ধীরে-ধীরে গাড়ী ছেড়ে দিলে;—মনে হ'ল, আমার সমস্ত বল-ভরসা ঐ গাড়ীখানা নিজের গারদের মধ্যে পূরে নিয়ে চ'লে গেল। আমি কাঁদো কাঁদো চোখে সেই পলাতকটার দিকে চেয়ে র'লুম।

এখান থেকে বিশ মাইল গোরুর গাড়ীর পথে ভিটেমাটি। সেইখানে আমায় যেতে হবে। এখন গাড়ী ছাড়্‌লে কা'ল ভোরে গিয়ে পৌঁছব। মনের রাশটার

উপর একটা কড়া হ্যাঁচ্‌কা দিয়ে আমি প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বাইরে এলুম। সেখানে খান-দুই পেট-ফুলো গোরুর গাড়ী আকাশের দিকে পা তুলে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। গাড়োয়ানকে তখনই পাওয়া গেল বটে, কিন্তু গোরু খুঁজে বা'র কর্‌তে অনেক দেরী হ'ল। এর মধ্যে খাবারের পুঁটুলি খুলে আমি কিছু খেয়ে নিলুম।

ছই-ঢাকা গাড়ীর মধ্যে বিছানা পেতে, পাশে কাপড়ের ব্যাগটি রেখে আমি চুপ ক'রে বস্‌লুম। যাত্রা সুরু হ'ল—সাম্‌নের ঘনঘোর অন্ধকারের দিকে! দুধারে শাল-বন, মধ্যে সরু পথ, তার উপর দিয়ে গাড়ী চল্‌ছিল। ক্রমে-ক্রমে গ্রামের যে দুটি-একটি আলো দেখা যাচ্ছিল, তা মুছে গেল। কোথা থেকে মাদলের আওয়াজ আস্‌ছিল, তাও মিলিয়ে গেল। যা রইল, সে কেবল অন্ধকার। যতই দূরের দিকে দৃষ্টি দিই, ততই দেখি, অন্ধকার আরো জমাট! তখন আমার মনটা এমনি কর্‌তে লাগল যে, যেমন-করে-হোক্ কোনোরকমে এই অন্ধকারটা তীরবেগে পেরিয়ে এখনই একটা আলোর মধ্যে পৌঁছই। কিন্তু হায়, আমার বাহন! সে আমার মনের উপর

মোচড়ের পর মোচড় দিয়ে-দিয়ে এই বিরাট অন্ধকারটিকে রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করতে-করতে, অগ্রসর হবার কোনো তাগিদ না রেখে, খোস্-মেজাজে, অতি ধীর-মন্থরগতিতে চলতে লাগ্‌ল।

সামনের দিক্ থেকে যে আকাশটুকু দেখা যাচ্ছিল, তার মধ্যে দেখ্‌লুম, একটি শিশু-তারা আমারই মতো একলা ঐ অনন্ত অন্ধকার সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে;—আমারই মতো ভয়ে তার বুকখানি থর্-থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে। সেইটিকে দেখে আমার মন যেন আশ্বস্ত হ'ল। কিন্তু চলবার পথে কোথায় যে আমার এই নবীন বন্ধুটি হারিয়ে গেল, তার সন্ধান পেলুম না। এতক্ষণ মনের মধ্যে যে আলোকটুকু পাচ্ছিলুম, সেটুকুও নিভে গেল।

তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আমার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল আমার মায়ের মুখখানি, আমার ছোট বোন্‌দের জল্‌জলে চোখগুলি! তার পর ঘুরতে-ঘুরতে আমার চিন্তা এসে পৌঁছল রেলগাড়ীর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির উপর—যাঁকে আমি ঘটক ব'লে স্থির ক'রে নিয়েছিলুম।

হঠাৎ দেখি, গোরুর গাড়ী বন পেরিয়ে একটা

জলার মধ্যে এসে পড়েছে। সেখানে চারিদিক্ খোলা পেয়ে, বাতাসটা ছোটো ছেলের মতো মহা ফূর্ত্তির সঙ্গে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। হঠাৎ একটা কালো পাখী তার প্রকাণ্ড ডানা-দুখানা দিয়ে বাতাসের গায়ে চাপড় মেরে সাম্‌নে দিয়ে উড়ে গেল;—আমি তার শব্দে চম্‌কে উঠ্‌লুম।

আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"এ জায়গা-টার নাম কি রে?"

সে বল্লে—"ধড়ভাঙা!"

ধড়ভাঙা কথাটার মধ্যে কি ছিল জানি না, হঠাৎ আমার বুকটা দুব্‌দুব্ ক'রে উঠ্‌ল।

এতক্ষণ ঘন-বনের মধ্যে দিয়ে আস্‌ছিলুম ব'লে বোধ হয়, চারিদিকের আঁটসাঁটে মনটা একরকম নিশ্চিন্ত ছিল; হঠাৎ এই ধূধূ-কর্‌ছে খোলা-জায়গা দেখে মনে হ'ল যেন কোন্ অকূলে পড়্‌লুম। তখন ঐ ধড়ভাঙা কথাটার ভিতরকার সেই অজানা ভীতি আমার বুকটাকে ঘন-ঘন দোলাতে লাগ্‌ল। মনে হ'তে লাগ্‌ল যেন ধড়ভাঙার মতো কি-একটা বিপদ্ এরই আশেপাশে

কোথায় লুকিয়ে আছে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমার সন্দেহ হ'ল, কে যেন পিছু নিলে। আমার সন্দিগ্ধ চোখ এমনি-ক'রে আশপাশ-গুলো দেখ্‌তে লাগ্‌ল যে কিছুতেই তাকে বাগ্‌ মানাতে পার্‌লুম না।

বিদেশ-বিভুঁইয়ের সঙ্গে চোর-ডাকাতের নাম ছেলেবেলা থেকে ঠাকুরমার নানা গল্প-গুজবের স্মৃতির মধ্যে জড়ানো আছে। তার পর রঘু ডাকাতের একটা কাহিনীর সঙ্গে আমার এই নিশীথ-যাত্রার বোধ হয় কোথাও একটু মিল ছিল; নইলে হঠাৎ আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌লুম কেন—"হ্যাঁ রে, এখানে ডাকাতের ভয় আছে?"

সে বল্লে—"ডাকাত কোথায় বাবু! অনেক-আগে এখানে ডাকাতি হ'ত শুনেছি।"

আমি যেন তার কথাটা ঠিক বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লুম না, তাই সজোরে ব'লে উঠলুম—"দেখিস্‌! ঠিক বল্‌ছিস্‌ ত?"

বলেই আমার মনটা ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। বোধ হয়, বুড়োর সেই চোর-সন্দেহের নেশাটা তখন আমায়

ধরেছে। আমার ভাবনা হ'তে লাগ্‌ল, গাড়োয়ানটার কাছে এমন ক'রে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা ঠিক হয়নি! এখানে ডাকাত না থাক্‌তে পারে, কিন্তু এতে ওকে সাহসী ক'রে তোলা হ'ল। আমি যে একা! ও-লোকটাও একা বটে, কিন্তু আমার চেয়ে ঢের বেশী জোয়ান;—ইচ্ছে করলে এখনই বেরাল-বাচ্ছার মতো আমার টুঁটি টিপে ধরতে পারে! এই নির্জ্জন স্থানে সেটা কিছুই শক্ত নয়। হাজার-চীৎকার করলেও এখানে সাড়া দেবার কেউ নেই। এমন ঘটনা ত ঢের শোনা গেছে—বিশেষ যখন এ-বৎসর দুর্ভিক্ষ! চারিদিক্ দেখে-শুনে আমি নিজেকে এমন অসহায় মনে করতে লাগ্‌লুম যে, আমার দেহের সমস্ত-শক্তি যেন কর্পূরের মতো উবে যেতে লাগ্‌ল।

গাড়ী সোজা-পথে আপন-মনে চল্‌ছিল। গাড়োয়ানটা ছইখানার একটা কিনারায় ঠেসান্ দিয়ে চুপ ক'রে বসেছিল। আমি কেবলই মনে করছিলুম—এই জলাটা কতক্ষণে পার হই! কিন্তু তার শেষ যে কোথায়, তার কোনো ঠিকানা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ছিলুম।

আমি মনে-মনে নিজেকে নিজে ধমক দিয়ে-দিয়ে বুকটাকে একটু চিতিয়ে নিলুম। তার পর তখনই স্থির ক'রে ফেললুম, যে-অন্যায়টা ক'রে ফেলেছি, সেটা শুধ্‌রে নিতে হ'বে। তখন সেই রেলগাড়ীর বুড়োকে মনে-মনে বার-বার ধন্যবাদ দিতে লাগ্‌লুম। সে-সময় তাঁর কথা-গুলোকে খুব-একটা ঠাট্টার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলুম বটে, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সে-সব সত্যিই কাজে লেগে গেল। ভাগ্যিস্ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল! ভাগ্যিস্ তিনি সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন! নইলে আজ তো বেঘোরে প্রাণটি গিয়েছিল!

আমি গাড়োয়ানটাকে বল্লুম—"দেখ্, আমি ডাকাতের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি কেন জানিস্?—আমি ডাকাত ধর্‌তে এসেছি!"

গাড়োয়ানটা কোনো কথা কইলে না, কেবল আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইতে লাগ্‌ল।

আমি গলাটায় বেশ-একটু জোর দিয়ে বল্লুম—"আমাকে একলা মনে করিস্‌নি; আমার সঙ্গে বিস্তর লোক আছে। তারা এই আশে-পাশে লুকিয়ে-লুকিয়ে

চলেছে; একটা সিটি মার্‌লেই হুড়-মুড়্ ক'রে এসে পড়্‌বে।"

গাড়োয়ানটা আমার দিকে কেমন-এক-রকম-ক'রে চাইতে লাগ্‌ল, তার অর্থ আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। মনে হ'ল, সে আমার কথা বিশ্বাস কর্‌ছে না। তাইতে আমার মনে আরো ভয় হ'তে লাগ্‌ল। তাকে বিশ্বাস না করালে ত চল্‌বে না!

আমি বল্লুম—"ঐ যে আমার ব্যাগ্ দেখেছিস্, ওটার ভিতর বড়-বড় পিস্তল ঠাসা। ওর এক-একটা পিস্তলে ছ-ছটা ক'রে মানুষ মারা যায়। তা ছাড়া, আমার বুক-পকেটে দুটো খুব ভালো পিস্তল আছে।"

পিস্তলের নাম শুনে গাড়োয়ানটা ভয় পেয়েছে মনে হ'ল। তা হ'লে এতক্ষণে ওষুধ ধরেছে! এই ভয়টাকে আরো ঘন ও দৃঢ় ক'রে তোল্‌বার উপায় আমি মনে-মনে খুঁজ্‌তে লাগ্‌লুম।

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বল্লুম—"হুঁ! আমি খবর পেয়েছি, এখানকার ডাকাতরা গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান সেজে সওয়ারিদের লুঠ-তরাজ করে! নইলে আমার

গোরুর গাড়ীতে আস্‌বার দরকার কি ছিল? আমি হাওয়া-গাড়ীতে আস্‌তে পার্‌তুম না!"

গাড়োয়ানের মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল। কিন্তু সে এমন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল যে, আমার সন্দেহ হ'ল, এই-বার আমাকে আক্রমণ করে বুঝি! কিন্তু আমি নিজেকে দম্‌তে দিলুম না। তাড়াতাড়ি একটা হাত আমার বুক-পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলুম। অমনি দেখি, সে কেঁচোর মতো কুঁকড়ে গেছে।

এখন থেকে আমি ভারি সতর্ক হয়ে রইলুম। গাড়োয়ানটাকে মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের আড় কর্‌লুম না। কি জানি, যদি অন্যমনস্ক পেয়ে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে! বলা বাহুল্য, আমি তখনো ভিতরে-ভিতরে কাঁপ্‌ছি। কিন্তু সে-কাঁপুনি যাতে বাইরে প্রকাশ না পায়, তার জন্যে স্নায়ুগুলোকে দৃঢ় রাখ্‌বার প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

খানিক-ক্ষণ চুপ ক'রে কেটে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল, গাড়োয়ানের ভয়টাকে জুড়োতে দেওয়া ঠিক নয়। আমি তখন যেন আপনার মনেই বল্‌তে সুরু কর্‌লুম—

"ডাকাত যদি ধর্‌তে পারি, তা হ'লে মজাটা টের পাইয়ে দিই, একেবারে পুলিপোলাও চালান!"

পুলিপোলাওর নাম শুনে গাড়োয়ানটা অস্ফুটভাবে আঁৎকে উঠ্‌ল—দেখ্‌লুম। মনে-মনে ভাব্‌লুম—এইবার ঠিক হয়েছে!

গোরুর মুখের দড়ি, গাড়োয়ান ছেড়ে দিয়েছিল,—গোরুদুটো আপনিই চল্‌ছিল। এতক্ষণ সে ছইখানার পিঠে ঠেসান দিয়ে পড়েছিল, এইবার সোজা হয়ে বস্‌ল। পিঠটাকে খাড়া ক'রে সে কেবলই রাস্তার দিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আমার বুকটা আবার ছাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল—তাই ত, এ-রকম করে কেন! এখানে ওর দলবল লুকিয়ে আছে নাকি!

আমি আর কিছুমাত্র বিলম্ব না ক'রে খপ্-ক'রে তার হাতখানা ধ'রে ফেল্লুম। আশ্চর্য্য, সে কোনো জোর দেখালে না। কেন? তাই ত, এর মানে কি! সন্দেহে আমার বুকটা ধক্‌ধক্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

কি কর্‌ব, ঠিক কর্‌তে না পেরে আবার খানিকক্ষণ চুপ ক'রে কেটে গেল। গাড়োয়ানটা যে ভয় পেয়েছে,

তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু সয়তানকে বিশ্বাস কি !

ছেলেবেলায় শুনেছিলুম, বাঘের চোখের উপর যদি সাহস ক'রে চেয়ে থাক্‌তে পারা যায়, তা হ'লে বাঘ কিছুই করতে পারে না ; কিন্তু যেই ভয়ে চোখের পাতাটি কোঁচ্‌কাবে, অমনি সে থাবা মেরে বস্‌বে। এই গল্পের নীতিটা যে তখন আমার মনের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার ক'রে বসেছিল, সে আমার কার্য্য থেকেই প্রমাণ হচ্ছে।

ভয়টাকে আরো ঘোরালো করবার একটা ফন্দি সেই বুড়োর গল্প থেকে হঠাৎ মাথায় এল। আমি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, গলার স্বরটাকে খুব দৃঢ় ক'রে ব'লে উঠ্‌লুম—"হুঁ, এই ত ঠিক মিল্‌ছে দেখ্‌ছি !"

যেমন আমার কথা শেষ হওয়া, অমনি মনে হ'ল, আমার হাতের ভিতর থেকে তার হাতখানা যেন একবার একটু হ্যাঁচ্‌কা দিলে। আমি সজোরে চেপে ধরলুম।

আমি বল্‌তে লাগ্‌লুম—"এখানকার এক ডাকাত-

গাড়োয়ানের ছবি আমার কাছে আছে। ডাকাতটা জানে না যে, তার ছবি কেমন ক'রে বেরিয়ে গেছে। সে ভারি মজা! সে যে-লোকটাকে খুন করে, মর্‌বার সময় সে চোখ মেলে মরেছিল, তাইতে ডাকাতের ছবিটা সেই চোখে আট্‌কা পড়ে যায়। সে-ছবির নকল আমার কাছে আছে। তার সঙ্গে তোর মুখের চেহারাটা যেন—" বল্‌তে-বল্‌তে তার মুখখানা খুব তীব্র দৃষ্টি দিয়ে আমি দেখ্‌তে আরম্ভ করেছি, এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মতো একটা দম্‌কায় আমার হাত ছিনিয়ে লোকটা তড়াক্-ক'রে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়্‌ল। তার পর, একেবারে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট!

তার পর সেই জনমানবশূন্য ভয়াবহ অন্ধকার জলার মধ্যে চালকহীন গাড়ীতে একলা আমি—আমার যে দুর্দ্দশাটা হ'ল, তা আর বল্‌তে ইচ্ছে করে না। কিন্তু যখন আরম্ভ করেছি, তখন শেষ কর্‌তেই হবে।

সেই প্রকাণ্ড লাফানির একটা ঝাঁকানি খেয়ে গোরু দুটো থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। আমি একেবারে অবাক্! কি যে হ'ল, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। একবার মনে

হ'ল, বোধ হয়, খুব ভয় পেয়েছে, তাই পালালো। তার পর মনে হ'ল, নিশ্চয় দলের লোক ডাকতে গেছে। আমি ডাকাত ধরতে এসেছি, এ-খবর ডাকাতদের দলের মধ্যে এতক্ষণ রাষ্ট হয়ে গেল;—ডাকাত-ধরার মজাটা তারা এইবার আমাকে দেখাতে আসচে।

কি যে করি, কিছু ঠিক করতে পারলুম না। এক-বার চীৎকার ক'রে গাড়োয়ানটাকে ডাকলুম—"ওরে শোন্, শোন্!"

কিন্তু কে তখন শোনে!

ভাবলুম, যে দিকে হোক্ একদিকে দৌড়ে পালাই। কিন্তু অন্ধকারে ভয় হ'তে লাগ্‌ল। তাছাড়া দৌড়-দেবার মতো শক্তি তখন আমার ছিল কি-না সন্দেহ। আমি সেই অন্ধকারে একলাটি গাড়ীর মধ্যে কাঠ-হয়ে ব'সে রইলুম। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার বুক এমন ধক্-ধক্ করতে লাগ্‌ল যে তার শব্দে চম্‌কে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম্।

এমনি-ক'রে ব'সে থেকে মনে হ'ল যেন আমার নিশ্বেস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে। ভাব্‌লুম, গাড়ীটাকে দিই চালিয়ে; চলার বাতাসে তবু মনের হাঁপানি কমবে।

অনেক চেষ্টা কর্‌লুম, কিন্তু গোরু-দুটো আমার হাতে এক পা-ও নড়্‌ল না। তখন লাঠি নিয়ে ঘা-কতক কসিয়ে দিলুম, তাতে অল্প-একটু চলেই আবার থেমে পড়্‌ল। আবার লাঠি চালালুম, তাতেও সেই সমান অবস্থা। আমার উৎসাহ ভেঙে গেল। তখন আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল, এই নির্জ্জনতার কবরের মধ্যে যেন তিল-তিল ক'রে আমার সমাধি হচ্ছে। আমি হতাশ হয়ে গাড়ীর মধ্যে শুয়ে পড়্‌লুম। হায়, আমার অদৃষ্টে কথামালার মেষপালকের মতো বাঘ বাঘ বল্‌তে বল্‌তে শেষে কি সত্যই বাঘ এসে পড়্‌ল! আমি চোখ বুজে কেবলই দেখ্‌তে লাগ্‌লুম—সারি সারি ডাকাতের দল—কেবলই তারা আস্‌ছে,—পিঁপড়ের সারের মতো চ'লে চ'লে আস্‌ছে।

কতক্ষণ শুয়ে পড়েছিলুম, জানি না; হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা কলরব শুনে চম্‌কে উঠ্‌লুম;—হাজার হাজার লোক যেন হল্লা কর্‌তে কর্‌তে এগিয়ে আস্‌ছে।

এই নির্জ্জন জায়গায় একসঙ্গে এত লোক কোত্থেকে

আস্‌বে? নিশ্চয় ডাকাতের দল! ব্যস্‌, এইবার আমার সব শেষ!

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আমি উঠে বস্‌লুম। আত্মরক্ষার একটা তাড়না আগুনের ফুল্‌কির মতো একবার জ্বলে উঠে হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেল। কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল—হায় হায়, নিজের বিপদ্‌ নিজে ডেকে আন্‌লুম! একা গাড়োয়ানের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুঝ্‌তেও ত পার্‌তুম। তার পর যা হয় হ'ত। কিন্তু আমার বুদ্ধির কারখানায় তৈরি ঐ পিস্তলের বস্তাকে ব্যর্থ কর্‌বার জন্যে সশস্ত্র ডাকাতের যে প্রকাণ্ড দলটি আস্‌ছে, তাদের এখন ঠেকাই কি ক'রে? মেকি পিস্তলের ফাঁকি আওয়াজে গাড়োয়ানের মনকে জব্দ করেছিলুম বটে, কিন্তু এই অগণন জল্‌জ্যান্ত শত্রুদের মোটা-মোটা লাঠিসোটাগুলোকে ত ঐ ফাঁফা-আওয়াজে ফেরানো যাবে না। তবে উপায়?

এইবার আমার মনের রাশ একেবারে এলিয়ে গেল। ভাবনা-চিন্তার সমস্ত খেই যেন হারিয়ে ফেল্লুম। তখন কি যে হ'ল না হ'ল, কিচ্ছু মনে নেই; কেবল

এইটুকু মনে আছে যে, লুকোবার আর জায়গা না পেয়ে আমি গাড়ী থেকে সুড়্ সুড়্ ক'রে নেমে গাড়ীর তলায় গিয়ে সেঁধিয়েছিলুম; চারিদিক্‌কার ঐ খোলা জায়গার মধ্যে এই ঘের-দেওয়া স্থানটুকু ভারি নিরাপদ্ ব'লে মনে হয়েছিল; এবং গাড়ীর চাকাদুখানা যেন সুদর্শন-চক্রের মতো আমায় ঘিরে ছিল।......

যারা হল্লা কর্‌তে-কর্‌তে আস্‌ছিল, তারা আমার গাড়ীর সাম্‌নে এসে থেমে পড়্‌ল। মনে কর্‌লুম, এখনই একটা হৈ-হৈ মার্-মার্ কাট্-কাট্ শব্দ উঠ্‌বে। কিন্তু তা কৈ হ'ল না। বোধ হয়, সব-আগে আমাকে খুঁজ্‌ছে! আমি নিজেকে লুকোবার জন্যে গায়ের চাদরখানা টেনে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিলুম।...

দলের কতক লোক এগিয়ে চ'লে গেল ব'লে মনে হ'ল; কতক লোক সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভাব্‌লুম, এইবার এরা ব্যূহ রচনা কর্‌ছে। শুনেছে, আমার সঙ্গে বিস্তর লোক আছে, তাদের ঘেরাও কর্‌বার ফন্দি কর্‌ছে। তা হ'লে আমার পালাবার পথটি পর্য্যন্ত আর রইল না! ইস্, আমার প্রত্যেক মিথ্যাটি আমার

কাছ থেকে সুদসুদ্ধ দাম আদায় না ক'রে ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি !...

লোকগুলোর ভাবগতিক আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিলুম না। একটা সংশয়ের মধ্যে প'ড়ে আমার মনের ভয়টা এত দোল খাচ্ছিল যে, থেকে-থেকে আমি জ্ঞানের সীমাও ছাড়িয়ে যাচ্ছিলুম।...

তারা মহা ব্যস্ত হয়ে কেবলই এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘোরাঘুরি কর্‌ছিল, আর নিজেদের মধ্যে কি বলা-বলি কর্‌ছিল—যেন কি খোঁজ কর্‌ছে। সে আর কে? সে এই হতভাগ্য আমি !...

হঠাৎ কে-একজন গাড়ীর তলায় উঁকি মেরে দেখেই চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। আমার মাথা ঘুরে, গা ঝিম্‌-ঝিম্‌ ক'রে, আমি একেবারে অবশ হয়ে পড়্‌লুম।...

যখন একটু জ্ঞান হ'ল, তখন মনে হ'ল, কে যেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছে—"বাবু, চোট কি বেশি লেগেছে?"...

আমি বুঝ্‌লুম, আমি প্রাণে মরিনি— বন্দী হয়েছি মাত্র !...

তারা ধরাধরি ক'রে আমাকে গাড়ীর উপর তুল্লে। আমি চোখ-বুজে প'ড়ে রইলুম। হঠাৎ চোখের পাতার ফাঁকে মনে হ'ল যেন ভোরের আলো উঁকি মারচে। ঐ আলোর সঙ্গে-সঙ্গে মনে একটু আশার আলোর উদয় হ'ল। আমি চোখ-চেয়ে উঠে বস্লুম।

একটা ঝাঁক্ড়াচুলো লোক আমাকে জিজ্ঞাসা কর্লে—"কোথা যাবেন বাবু?"

আমি প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য্য হলুম;—অর্থটা কি, বুঝ্তে পার্লুম না। আমাকে কোথায় ধ'রে নিয়ে যাবে, সে তো ওরাই জানে, আমি তার কি জানি!

আমি চুপ ক'রে আছি দেখে, সে আবার জিজ্ঞাসা কর্লে—"কোথায় যাবেন কর্ত্তা?"

আমি ভাঙা-ভাঙা গলায় বল্লুম—"ভিটেমাটি।"

একজন ব'লে উঠ্ল—"ওরে, ওটা আমাদের নয়া নেস্পেক্টাবাবু।"

আর একজন বল্লে—"চল্ বাবু, চল্। মোরাও যাব।"

আর-একজন বল্লে—"বাবু-গো, আমরা যে হেথা-কার কুলি—কাজে বেরিয়েচি!"

আর-একজন বল্লে—"ওরে চল্ চল্— আর দেরি করিস্‌নে, ঐ কলের বাঁশী বাজ্‌তে লেগেছে!"

এমনি হট্টগোলের মধ্যে একটা লোক তড়াক ক'রে আমার গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে গোরুর ল্যাজ মল্‌তে সুরু ক'রে দিলে।

আবার যাত্রা আরম্ভ হ'ল। সঙ্গে-সঙ্গে লোকগুলো গণ্ডগোল কর্‌তে কর্‌তে চল্‌ল। রথারূঢ় বিজয়ী বীরের মতো সৈন্যপরিবৃত হয়ে আমি কর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লুম।

খানিক বাদে যে লোকটা গাড়ী হাঁকাচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"বাবু, আপনার গাড়োয়ান গেল কোথায়?"

আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে বল্লুম—"সে আমায় একলা ফেলে পালিয়েছে।"

সে অবাক্ হয়ে বল্লে—"পালালো কেন বাবু?"

নিজের আহাম্মকিটা ঢাক্‌বার জন্যে হয় ত একটা

মিথ্যা বল্‌বার দরকার ছিল, কিন্তু মিথ্যা রচনা করার জন্যে যে সাজা পেয়েছি, তার পর আর মিথ্যে নিয়ে খেলা কর্‌বার প্রবৃত্তি হ'ল না। আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম—

"আমি তাকে ভয় দেখিয়েছিলুম!"

নতুন গাড়োয়ানটা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"এখানকার লোকগুলো অমনি-ধারা বোকাম্যাড়া! ঠাট্টা বোঝে না, বাবু।"

আমি মনেমনে বল্লুম, কে যে বোকা, আর কে যে কার ঠাট্টা বুঝ্‌লে না, বলা শক্ত।...

তার পর, দুপুরবেলা, আমার কাজকর্ম যখন বুঝে নিচ্ছি, তখন দেখি, সেই ঝাঁকড়া-চুলো লোকটা আমার সেই গাড়োয়ানটাকে ধ'রে এনেছে। তাকে ধমক দিয়ে সে বল্‌ছে—

"যা—বাবুর পায়ে ধর্‌!"

ব্যাপারটা বোধ হয় আগাগোড়া ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। নইলে কুলিগুলো আমাদের দিকে চেয়ে অমন চোখ-মোটকে হাসাহাসি করছিল কেন!

গাড়োয়ানটা ধমক-খেয়ে আমার দিকে কাঁচুমাচু হয়ে চাইতে লাগ্‌ল; আর, মিথ্যা যখন বল্‌ব না প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন বল্‌তেই হবে, আমিও যে তার দিকে খুব সহজ-চোখে চাইতে পার্‌ছিলুম, তা নয়।

ওবেলায়

এবার দার্জিলিঙে এসে এই কাহিনীটি শুন্‌লুম :—

অনেক দিনের কথা। ভুটিয়া-বস্তীতে এক ইংরেজ পাদ্রী বাসা বেঁধেছিলেন। ভুটিয়ারা সবাই তাঁকে বড় ভালোবাস্‌ত—বিশেষ ক'রে ভুটিয়া-শিশুগুলি।

বিপদ্‌-আপদে এই পাদ্রীসাহেব ভুটিয়াদের বল-ভরসা সবই। কারুর অসুখ কর্‌লে বুক দিয়ে প'ড়ে তিনি সেবা কর্‌তেন,—তাঁকে ডাক্‌তে হ'ত না। এমন তাঁর আদর-যত্ন যে, আপনার জনও হার মেনে যায়।

পাদ্রীসাহেবের নিজের সংসার ছিল না। ভুটিয়াদের নিয়েই তাঁর সংসার। তাদের ভালোমন্দ নিয়েই তাঁর

ভাবনাচিন্তা। ভুটিয়া-পাড়ায় যেখানে যা-কিছু ঘট্‌ত, পাদ্রীসাহেবের অজানা থাকৃত না, এবং ছোট-বড় যে রকম অনুষ্ঠানই হোক না; তার মধ্যে তাঁর হাতের চিহ্ন, তাঁর পরামর্শ থাকৃতই থাকৃত। কোথাও বিবাদ বাধ্‌লে সকলের আগে তাঁরই ডাক পড়্‌ত এবং বিবাহের মিলন-সূত্রটি বাঁধা হবার সময়ও তাঁকে বাদ দেওয়া চল্‌ত না।

ভুটিয়া-শিশুগুলি যেন তাঁর প্রাণ ছিল। তাদের বুকে ক'রে, কোলে ক'রে, পিঠে ক'রে, কাঁধে চাপিয়ে, মাথায় বসিয়ে, চট্‌কে, টিপে, কাঁদিয়ে, হাসিয়ে, তাঁর মনের আশ যেন মিট্‌ত না। তাঁর কাছে সুন্দর কুৎসিত ছিল না—ছেলে হলেই হ'ল! রাস্তার উপর থেকে ধূলা-কাদা-মাখা ছেলে অবলীলাক্রমে তিনি বুকে তুলে নিয়ে চুমু খেতেন; মনে কোনো ঘৃণা হ'ত না। অনেক সময় নিজের হাতে তাদের গায়ের ময়লা পরিষ্কার ক'রে দিতেন। তাতে তাঁর আনন্দই ছিল। ছেলেরাও তাঁর ভারি ন্যাওটা। দেখ্‌বামাত্র ছেলের পাল তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত; —কেউ লাফিয়ে বুকে উঠ্‌ত, কেউ কাঁধে উঠ্‌ত, কেউ দুহাত দিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃত।

ভুটিয়াদের মানুষ ক'রে তোল্‌বার জন্যে তাঁর মনে অনেক-কিছু সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু নিজের সামর্থ্য ও সংস্থান তেমন ছিল না ব'লে বেশী-কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। যা কর্‌তে পেরেছিলেন, সে একটি স্কুল। স্কুলটিও যে রীতিমত বাড়ী-তুলে তৈরি কর্‌তে পেরেছিলেন, তা নয়,—স্কুলের জন্য নিজের বস্‌বার ঘরটি ছেড়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাইতেই স্কুল বেশ চল্‌ত;—পাড়ার সব ছেলে সেখানে একত্র হ'ত। একসঙ্গে সবাইকে তিনি পেতেন—এতে তাঁর ভারি আনন্দ ছিল। সেখানে পড়া-শুনা যত না হ'ত, খেলা-ধূলা তার চেয়ে ঢের বেশী হ'ত, সেই জন্য ছেলেরা সে জায়গাটা ছাড়্‌তে চাইত না।

এই স্কুলে আর একটি ব্যাপার হ'ত; সে নানারকম উৎসবের অনুষ্ঠান। এই সব উৎসবে আলো জ্বালিয়ে, ফুল ছড়িয়ে, নিশান উড়িয়ে, বাঁশী বাজিয়ে যে ঘটাটা হ'ত, তার রেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত ছেলেদের মনকে মাতিয়ে রাখ্‌ত। কিন্তু সব-চেয়ে জমৃত বড়-দিনের উৎসবটি। সে-সময় খাওয়া-দাওয়া এবং অন্য আমোদ তো থাক্‌তই, তার উপর লাভ হ'ত নানা রকমের রঙিন

খেল্‌না। এই খেল্‌নাগুলি পুরা আকারে না হোক, টুক্‌রোটুক্‌রো হয়েও সারা-বছর ছেলেদের হাতেহাতে দিনরাত ঘুর্‌ত।

২

সে বৎসর উৎসবের দিন, ভোর না হতেই, ছেলেরা পাদ্রীসাহেবের দরজা ঠেল্‌তে আরম্ভ করেছে। পাদ্রী-সাহেব কিছুতেই তাদের ঘরে ঢুকতে দেবেন না। তিনি ঘরের ভিতর থেকে চীৎকার ক'রে বল্‌ছেন—"ওরে, এখন না! এখন তোরা যা! ওবেলা আসিস্‌।" কিন্তু সেকথায় কান দেয় কে? শেষে তারা সকলে মিলে এমন ঠেলাঠেলি আরম্ভ কর্‌লে যে, দরজা বুঝি ভেঙে পড়ে।

পাদ্রীসাহেব দেখ্‌লেন, ভালো-মুখে বল্‌লে হবে না। তখন তিনি ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন। ছেলেরা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল—তার পর কেউ ছল্‌ছল্‌-চোখে, কেউ কাঁদো-কাঁদো মুখে—করুণ-দৃষ্টিতে পাদ্রীসাহেবের দিকে চাইতে চাইতে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

আর-কোনো বাধা ছিল না। আজকের উৎসবের জন্য তাঁর ঘরটি তিনি নতুন-রকম ক'রে সাজাচ্ছিলেন; মতলব ছিল, এখন কারো কাছে ফাঁস করবেন না, সন্ধ্যার অন্ধকারে ছেলেদের একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেবেন। সেই জন্য এবারকার উৎসব, সকাল থেকে আরম্ভ না হয়ে, সন্ধ্যাবেলা হবার আয়োজন হয়েছিল। তৈরি-করা গাছ দিয়ে, লতাপাতাফুল দিয়ে, ঝরণা দিয়ে ঘরের মধ্যে এমন একটি বাগান গড়ে তুলছিলেন যে, দেখ্লেই যেন ছেলে-দের মনে হয়—এ কি! এ যে স্বর্গের নন্দন-কানন! দিনের আলোয় এর মূর্ত্তি তেমন ফুট্বে না; সেই জন্য সন্ধ্যাবেলাকার ঝাপ্সা আলোর অপেক্ষায় ছিলেন। ছেলেদের এখন ঘরে ঢুক্তে দিলে এর মোহিনী মায়া নষ্ট হয়ে যাবে, সেই জন্য বাধ্য হয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে-ছিলেন। এর জন্যে তাঁর মনে কিন্তু একটি তীক্ষ্ণ বেদনা বিঁধে রয়ে গেল।

সমস্ত দিন তিনি ঘর সাজাতে ব্যস্ত। জান্লার ফাঁক দিয়ে এক-একবার তিনি দেখ্তে পাচ্ছিলেন—ছেলেগুলো আশেপাশে ম্লানমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে; আজ

তারা কোনো খেলাতেই মন দিতে পারছে না। আজ যেন তারা পথের কাঙাল ;—আশ্রয় নেই, আত্মীয় নেই, তাদের জীবনের স্ফূর্ত্তিই যেন উবে গেছে—এমনি তাদের মুখের ভাব।

পাদ্রীসাহেব জানলা দিয়ে ঘন ঘন আকাশের দিকে চাচ্ছিলেন—কখন্ দিনের আলো একটু ম্লান হয়ে আসে।

বিকেল যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় তিনি ঘর থেকে একবার বেরিয়ে এলেন ছেলেদের বল্‌তে—ভালো কাপড়-চোপড় পোরে উৎসবের জন্য তারা তৈরি হয়ে আসুক। কিন্তু বাইরে এসে দেখ্‌লেন, কেউ কোথাও নেই। ভাব্‌লেন, বল্‌বার আর তাদের তর্ সয়নি ; নিজেরাই গেছে।

সন্ধ্যার সঙ্গে-সঙ্গে কোথা থেকে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এল। ধূসর সন্ধ্যাকে হঠাৎ একটা ঘন কালো পর্দ্দা দিয়ে কে যেন মুড়ে ফেল্লে। জোর বাতাস বইতে লাগ্‌ল ; বড়-বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নাম্‌ল।

পাদ্রীসাহেব একলাটি ঘরের মধ্যে ব'সে ব'সে ভাব্‌-

ছিলেন—কখন্ ছেলেরা আসে। বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বাড়্ছিল, ঝড়ের গর্জ্জনও ভীষণ হয়ে উঠ্ছিল! এই ঝড়-বৃষ্টি ঠেলে ছেলেরা কেমন ক'রে আস্বে, তাঁর একটা দুর্ভাবনা হচ্ছিল বটে, কিন্তু মনে এ আশাও হচ্ছিল যে, বৃষ্টি হয় ত শীঘ্রই থেমে যাবে, এবং ছেলেরা আজকের এই উৎসব থেকে কিছুতেই বাদ পড়্তে চাইবে না।…

ঘন-ধারায় বৃষ্টি পড়্ছে—উন্মত্ত গর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়ে ঝড় ছুটোছুটি কর্ছে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। প্রদীপের ম্লান আলোয় পাদ্রী-সাহেব ঘরের মধ্যে একা। ছেলেরা কৈ? ছেলেরা কৈ? উৎসবের আনন্দগুলি কৈ?—তাঁর প্রাণের মধ্যে থেকে কেবলই এই ব্যাকুল প্রশ্ন উঠ্ছে। এত সাজসজ্জা সবই নীরস হয়ে শুকিয়ে উঠ্ল যে! ভার হয়ে বুকে চেপে বসেছে যে! ঝড় বহে চলেছে,—তার পিছে-পিছে সময়ও বহে চলেছে,—কিন্তু অতিথি কৈ? অতিথি কৈ? উৎসবের আলোর শিখাগুলি যে এখনো জ্বল্ল না। আজকের এত আয়োজন যে ব্যর্থ হয়ে যায়!

একটি ব্যাকুল বেদনা পাদ্রীসাহেবের প্রাণটিকে

কাঁদিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর কেবলই মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল—ছেলেদের সেই ম্লান মুখগুলি! মনে হচ্ছিল, আজ তিনি যে আঘাত তাদের দিয়েছেন, সেই আঘাত ফিরে-ফিরে তাঁর বুকে এসে বাজ্‌ছে!…

ঝপ্‌ ক'রে একটা শব্দ ক'রে সমস্ত পৃথিবী যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল! বাতাস আর বইছে না, বৃষ্টি-ধারা আর নেই।

পাদ্রীসাহেবের মন আশান্বিত হয়ে উঠ্‌ল—এইবার ছেলেরা আস্‌বে। তিনি উদ্‌গ্রীব-প্রতীক্ষায় ব'সে রইলেন। এতক্ষণে তারা বাড়ী থেকে বেরিয়েছে!—এতক্ষণে তারা মাঝপথে!—ঐ বুঝি এল! তিনি উঠে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। কিন্তু কৈ? কেউ তো আসেনি!

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিনি অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তগুলি দীর্ঘ হয়ে-হয়ে তাঁর ব্যাকুল মনকে আরো ব্যাকুল ক'রে তুল্‌তে লাগ্‌ল। সময় তো বহে যায়—তবু তো তারা আসে না! তাঁর মনের ভিতর কে যেন ব'লে উঠ্‌ল—তারা অভিমান-ভরে চ'লে গেছে, ব্যথা

পেয়ে চ'লে গেছে; আর ফিরে আস্‌বে না—ফিরে আস্‌বে না!…

হঠাৎ একটা দম্‌কা-হাওয়া, তাঁর ঘরের দুখানা দরজা ধ'রে সজোরে একবার নাড়া দিয়ে, চ'লে গেল। ঘরের উপরকার টিনের চালখানা একবার ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌ল। দেয়ালের গা থেকে ফুলের মালাগুলো খসেখসে পড়্‌তে লাগ্‌ল। দরজা-জানলার ফাঁক দিয়ে কেমন একটা শির্‌-শিরে বাতাস এসে তাঁর সমস্ত শরীরটাকে শিউরে দিতে লাগ্‌ল।…

হঠাৎ ঘরের বাইরে মৃদু পায়ের শব্দ, অস্ফুট কল-ধ্বনি শোনা গেল। মনে হ'ল, কারা যেন ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে কথা কইছে, টিপে টিপে পা ফেল্‌ছে। কিন্তু ঘরের ভিতর কেউ আস্‌ছে না। এ নিশ্চয় তাদের অভিমান—অভিমানের নীরব তিরস্কার!

পাদ্রীসাহেব তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে হাত ধ'রে তাদের আন্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দরজা আর খুল্‌তে হ'ল না; ঝড়ের ঝাপটে দরজা আপনি খুলে গেল। কে যেন হুহু শব্দে ঘরের মধ্যে ছুটে এল—আলো নিবিয়ে,

ফুল ছিঁড়ে, সমস্ত সাজসজ্জা একেবারে ওলট-পালট ক'রে দিয়ে তাণ্ডব-নৃত্যে মেতে উঠ্‌ল।

পাদ্রীসাহেব অনেক চেষ্টা করলেন, বাতি আর জ্বল্‌ল না; যেন কার তীব্র ফুৎকারে বার-বার নিভে যেতে লাগ্‌ল। বাইরে তখনো চাপা-গলার মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। পাদ্রীসাহেব স্নেহের স্বরে ডাক্‌লেন—"ওরে, তোরা আয়! আর দেরী করিস্ নে।"

একদল ছেলে ঘরের মধ্যে ধীরে-ধীরে প্রবেশ করলে। তাদের কারো মুখে একটি কথা নেই—এত টুকু হাসি নেই।

পাদ্রী মনে-মনে বল্‌লেন—'এ অভিমান শীঘ্রই ঘুচ্‌বে—রোসো, আগে খেল্‌না বা'র করি।' তিনি অন্ধকারের মধ্যে হাত্‌ড়ে-হাত্‌ড়ে ছেলেদের জন্য খেল্‌না বা'র করতে লাগ্‌লেন—

—এই নে তোর বাঁশী!

—এই নে তোর ফানুস!

—এই নে তোর কলের গাড়ী!

—এই নে তোর বিবি-পুতুল!

—এই নে—

কিন্তু এ কি! সমস্ত খেল্‌না মাটিতে গড়াগড়ি যে! কেউ যে তাঁর উপহার নেয় নি! তিনি সমস্ত উপহার উজাড় ক'রে ফেল্‌লেন, কৈ, কারো মুখে তো হাসি ফুটে উঠ্‌ল না! তিনি সকলকার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন—এখনও সেই ম্লান মুখ, সেই ছল্‌ছল্‌ চোখ।

—ওরে, তোদের এ কি দুর্জ্জয় অভিমান!

পাদ্রীসাহেব বাতি জ্বেলে দেখ্‌লেন, কৈ, ঘরে কেউ ত নেই! তখন ঝড় থেমে গেছে, তিনি ছুটে ছেলেদের ধ'রে আন্‌তে গেলেন।

কিন্তু গিয়ে দেখেন, ভুটিয়া-বস্তীর সেই অংশ— যেখানে ছেলেরা থাকৃত, সেখানটায় একটা গভীর গহ্বর দৈত্যের মতো হাঁ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে আছে—বাড়ী-ঘর-দুয়ার সমস্ত গ্রাস কোরে!

পাখী

১

[বালক ও পাখী]

—ভাই পাখী, একটা গল্প বল-না, তোমার দেশের গল্প। তোমার দেশ কোথা ভাই?

—আমার দেশ?—আমার দেশ তো কোথাও নেই!

—কোথা থেকে তবে এলে?

—ঐ—ঐখেন থেকে।

—অত দূর থেকে?

—দূর কোথায়? ও যে খুব কাছে! মাটি দিয়ে হেঁটে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হয়, কিন্তু উড়ে গেলে একেবারে সোজা!

—কোন্‌খান দিয়ে যাও?

—বরাবর সিধে গিয়ে—পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে—

—পাহাড় ? পাহাড় ত আমি দেখিনি।

—তার পর, নদী পেরিয়ে—

—নদী ? নদী আমি দেখেছি !

—তার পর, সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, নীল আকাশের ভিতর দিয়ে, রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, উড়ে উড়ে যাই।

—বাঃ বাঃ, বেশ মজা ত !—সবুজ মাঠের উপর দিয়ে ? নীল আকাশের ভিতর দিয়ে ? রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ? বাঃ বাঃ ! তার পর ?

—তার পর, কালো-কাজল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে, সাগর-জলের ঝাপ্‌সা আলোর তলা দিয়ে, কালো কষ্টি-পাহাড়ের ফাটলের ভিতর ঢুকে পড়ি।

—উঃ ! কালো পাহাড়ের ভিতর ঢুকে পড় ? সেখান থেকে বেরোও কেমন ক'রে ? অন্ধকার যে !

—ওর ভিতরেও আলো আছে।

—ভাই পাখী, তোমার সঙ্গে যাবার জন্যে ভারি ইচ্ছে করছে।

—বেশ ত, চল না !

—কেমন ক'রে যাব ?

—যেমন ক'রে আমি যাই।

—আমি ত উড়্‌তে পারি না।

—মনে কর্‌লেই পার্‌বে।

—মনে কর্‌লেই পার্‌ব ?

—হাঁ, পার্‌বে।

—কিন্তু ভাই, ঐ অন্ধকার! ওখানে ত যেতে পার্‌ব না।

—কেন পার্‌বে না ?

—আমার ভয় কর্‌বে।

—ভয় কিসের ?

—তা হ'লে আমি যেতে পার্‌ব ?

—মনে কর্‌লেই পার্‌বে।

—সত্যি ?

—সত্যি।

[হঠাৎ পদশব্দ। পাখী অদৃশ্য]

—ঐ পাখী চ'লে গেল—সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, কালো পাথরের—

[বাপের প্রবেশ]

—হ্যাঁরে, অত চেঁচাচ্চিস্ কেন? এখানে ত কাউকে দেখ্ছি না, তুই কার সঙ্গে কথা কইছিলি?

—বন্ধুর সঙ্গে।

—বন্ধুর সঙ্গে? বন্ধু কৈ?

—সে উড়ে গেল।

—উড়ে গেল কি রে?

—হাঁ বাবা, ডানা মেলে উড়ে গেল।

—সে পাখী না কি যে, উড়ে গেল?

—হাঁ!

—তুই তার সঙ্গে কথা কইলি?

—হ্যাঁ বাবা—সে কত কথা বল্লে।

—কথা বল্লে? তবে বুঝি ঐ টোলের পড়া-পাখীটা উড়ে এসেছিল। রাধা-কৃষ্ণ বুলি বল্ছিল বুঝি?

—না বাবা, রাধা-কৃষ্ণ ত বলেনি।

—ঠিক তাই বল্ছিল! তুই ছেলেমানুষ বুঝ্তে পারিস্ নি। তার গায়ের রং কেমন বল্ দেখি? সবুজ ত?

—না।

—লাল ?

—উহুঁ। ঝক্‌-ঝক্‌ করছে সাদা।

—সাদা পাখী? সাদা পাখী ত এ গাঁয়ে কারুর নেই।

—সে এখানকার পাখী নয়।

—তবে কোথাকার ?

—সে বল্লে, তার কোনো ঠিকানা নেই।

—তবে বুঝি বুনো পাখী ?

—তাই হবে।

—না খোকা, তুমি বুনো পাখীর সঙ্গে কথা কোয়ো না। সে পাখী নয়, নিশ্চয় কোনো মায়াবী পাখীর রূপ ধ'রে আসে। আমি তোমায় নতুন রাঙা সোলার পাখী এনে দেব, তাই নিয়ে খেলা কোরো।

—সোলার পাখী ত আমার আছে।

—তবে সোনার পাখী গড়িয়ে দেব।

—সে আমার চাই না—আমি আমার বন্ধুকে চাই।

—বন্ধুকে নিয়ে কর্‌বে কি ?

—সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, নীল আকাশের ভিতর দিয়ে, রাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, উড়ে উড়ে বেড়াবো—সে কত মজা !

—সর্ব্বনাশ ! উড়ে উড়ে বেড়াবি কি ? পাগল ছেলে ! তুই উড়্‌বি কি ক'রে ?

—বন্ধু বলেছে, মনে কর্‌লেই পার্‌ব।

—ওরে ওরে, তোর বন্ধুর কথা বিশ্বাস করিস্‌নে—করিস্‌নে ! কোন্ দিন মন্ত্র দিয়ে সত্যিই সে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—সে নিশ্চয় মায়াবী !

—না বাবা, সে আমার বন্ধু !

—ওরে, সে তোকে বশ করেছে—তার কথায় ভুলিস্‌নি ! সে তোকে নিশ্চয় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

—বেশ ত মজা হবে !

—মজা কি রে !

—কেমন সেই কালো-কাজল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে, সাগর-জলের ঝাপ্‌সা আলোর তলা দিয়ে, কষ্টি-পাথরের ফাটলের ভিতরে চ'লে যাব।

[খাতাঞ্জির প্রবেশ]

—খাতা বগলে ক'রে সেই তখন থেকে সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে বেড়াচ্চি—এখন হিসেব দেখ্‌বার সময়, এ সময় এখানে ব'সে কি কর্‌চ? ছেলেকে আদর কর্‌বার সময় কি এই—বাজে খরচ যে খাতায় ক্রমেই জমে উঠ্‌ছে—

—খাতাঞ্জিমশায়, আমি বড় বিপদে পড়েছি!

—বিপদ্‌ ত তোমার লেগেই আছে। হিসেব-ক'রে চল্‌তে পার্‌লে বিপদ্‌কে ভয় কিসের! কিন্তু এই হিসেবের কায়দাটা আর তোমাকে শেখাতে পার্‌লুম না।

—খাতাঞ্জিমশায়, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

—হ'ল কি?

—খোকার আমার কি হয়েছে!

—কি হয়েছে?

—বলে, পাখী তার বন্ধু, পাখী তার সঙ্গে কথা কয়—এই ব'লে খালি আবোল-তাবোল বক্‌ছে।

—ও-সব কিছু নয়, কিছু নয়। আদর দিয়ে দিয়ে

ওর মাথা বিগ্‌ড়ে দিয়েছ। খুব কোসে নামতা মুখস্থ কর্‌তে দাও দেখি, মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চ'লে এস, চ'লে এস—এখন কাজের সময়।

[উভয়ের প্রস্থান।

[পাখীর আবির্ভাব]

—এস ভাই পাখী, এস। কোথায় পালিয়েছিলে তুমি?

—ঐ যে একখানা জলভরা বর্ষার মেঘ দেখ্‌ছ—ওরই পিঠে চ'ড়ে একটু বেড়িয়ে এলুম।

—বাঃ বাঃ, বেশ ত! ভাই, আমায় কখন্‌ নিয়ে যাবে?

—তুমি তৈরি হলেই যাওয়া হবে।

—আচ্ছা, আমি তৈরি হয়ে থাক্‌ব। তুমি কখন্‌ আস্‌বে?

—তা ঠিক বল্‌তে পারি না—তুমি ঠিক থাক্‌লেই যাওয়া হবে।

[পদশব্দ। পাখীর অন্তর্দ্ধান]

(বাপের প্রবেশ)

—বাবা, বাবা, পাখী বলেছে, আমায় নিয়ে যাবে।

—চুপ, কর্! পাখী-পাখী করবি ত মার খাবি। এই নে ধারাপাত। সমস্ত দিন আজ নামতা মুখস্থ কর্—বিকেলে ষোলোর কোঠা অবধি গড়্-গড়্ ক'রে বলা চাই। আমার কাজ আছে—চল্লুম।

[প্রস্থান।

[বালক নামতা পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িল।]

২

[খাতাঞ্চি ও ছেলের বাপ]

—খাতাঞ্চিমশায়, এই এতটুকু বেলায় বাবা আপনার হাতে আমায় সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন—সেই অবধি আপনার কাছেই আমি মানুষ। আপনার হেফাজতে থেকে আমায় সংসারের দুঃখ একদিনও টের পেতে হয়নি।

—কিন্তু—বাবা, এত করেও তো তোমায় হিসেব শেখাতে পারলুম না।

—হিসেব আমি জানি না খাতাঞ্চিমশায়, কিন্তু আমি আপনাকে জানি, সেই জন্যে আমার হিসেব জান্‌বার দরকার হয় নি।

—কিন্তু আমি ত আর চিরদিন থাকৃব না। তোমাকে হিসেবটা শিখিয়ে দিতে পার্‌লে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌তুম। তুমি তোমার ছেলেকে শেখাতে; এমনি ক'রে হিসেবের ধারা বইয়ে দিতে পার্‌লে এ সংসারে আর কোনো দিন দুঃখদৈন্য আস্‌তে পার্‌ত না।

—কি কর্‌ব খাতাঞ্চিমশায়, আমি পার্‌লুম না— আপনার এমনি নির্ভুল বন্দোবস্ত যে, আমি হিসেব শেখ্‌বার ফাঁক পেলুম না,—প্রয়োজনই হ'ল না। আপনি যেখানে আছেন, হিসেব সেখানে ঠিক আছে—এ যে জলন্ত সত্য।

—তা না হয় মান্‌লুম, কিন্তু তোমার ছেলের কথা কিছু ভাব্‌ছ কি ?

—ভাব্‌ছি, বৈ কি ! কিন্তু কিছু কর্‌তে পার্‌ছি কৈ ? ধনদৌলত নিজের হাতে কিছু উপার্জ্জন করিনি ;—

পৈতৃক-সম্পত্তি হিসেবের খাতার মধ্যে পেয়েছিলুম ;—জমাখরচের মধ্যেই তা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা রয়ে গেল—তাকে নিজের খুসি-মতো দুহাতে ছড়িয়ে দিতে কোনো দিন পারলুম না। জীবনে হিসেবের খাতার বাইরে যা একটু পেয়েছি, তা এই ছেলেটি—

—কিন্তু ঐ হ'ল তোমার শনি। ঐ দরাজ ফাঁকে আমার এতদিনের পরিশ্রমের ফলসব গ'লে প'ড়ে যাবে। তুমি যদি হিসেব শিখ্‌তে, তা হ'লে এ বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা থাকত না। তা হ'লে ছেলেটিকে তোমার সম্পত্তির মূলধন ব'লে খাতায় জমা ক'রে নিতে। এখনও সময় আছে, হিসেব শেখ।

—হিসেব শিখ্‌তে রাজি আছি খাতাঞ্চিমশায়, কিন্তু আমার ঐ ছেলেটিকে খাতার মধ্যে জমা করতে বলবেন না। সবই খাতা গ্রাস করবে—আমার কিছু থাকবে না—এ আমি সইতে পারব না।

—তা কি ক'রে হবে? হিসেবের অত বড় একটা গলদ সাম্‌নে রেখে কি হিসেব চালানো যায়?

—খাতাঞ্চিমশায়, আপনাকে অমান্য করবার শক্তি

আমার নেই—আপনার কথার মধ্যে কোথাও এমন ছিদ্র পাই না যে, সেই ফাঁকে স'রে পালাই।

—তবে খাতাখানা আন্‌তে বলি?

—বলুন!

৩

[ছেলে ও বাপ]

—বাবা, আমার চোখের বাঁধন একটিবার খুলে দাও না।

—না খোকা। বাঁধন খুল্লে তোমার অসুখ সারবে কি করে?

—আমার ত অসুখ করেনি! কৈ, গা ত গরম হয়নি!

—ও অন্য-রকম অসুখ।

—দাও না বাবা, একটিবার খুলে—একটিবার—একটুখানি দেখা হলেই আবার বেঁধে দিয়ো।

—না খোকা, তা হ'লে রোগ সারতে দেরী হবে।

—তবে কখন্ খুলে দেবে?

—খাতাঞ্চিমশায় আসুন, তিনি এসে বল্‌বেন। আমি ত জানি না।

—বাবা, তুমি ত নিজের হাতে বেঁধে দিলে—তুমি জান না?

—খাতাঞ্চিমশায় বল্লেন, তাই বাঁধ্‌লুম, তিনি না বল্লে ত খোল্‌বার জো নেই।

—ওঃ তাই? আমি ভাব্‌লুম, তুমি নিজের থেকে বেঁধেছ। তুমি নিজের হাতে বাঁধ্‌লে, তাই বাঁধ্‌তে দিলুম, নইলে আর-কেউ হ'লে কক্‌খনো দিতুম না।

—মনে দুঃখ কোরো না খোকা!

—খাতাঞ্চিমশায় চোখ বাঁধ্‌তে বল্লেন কেন ব া?

—তিনি বলেন, কেবল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে—তাই আকাশটাকে ঢেকে রাখ্‌তে হবে।

—কি বাবা, আমি ত আকাশ বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি।

—অঁা দেখ্‌তে পাচ্ছ? সর্ব্বনাশ! রোসো, আর এক পুরু কাপড় জড়িয়ে দিই।

—বাবা, তবুও দেখ্‌তে পাচ্ছি।

—রোসো, আর এক পুরু—

—হাজার ঢাকলেও ঢাকা পড়্‌চে না, তবে কেন আমায় মিছে বাঁধনের কষ্ট দিচ্চ বাবা?

—একটু সয়ে থাক খোকা।

—আচ্ছা বেশ।

[খানিকক্ষণ উভয়ে চুপ]

—খোকা, অমন চুপ ক'রে আছ কেন বাবা? বড্ড কষ্ট হচ্ছে কি?

—তুমি বল্‌ছ, একটু সয়ে থাকি না বাবা!

—হ্যাঁ বাবা, একটু সয়ে থাক!

[উভয়ে আবার চুপ]

—বাবা খোকা, মুখটা অমন শুকিয়ে উঠ্‌ছে কেন বাবা? বড্ড কষ্ট হচ্ছে কি?

—তুমি বল্‌ছ, একটু না-হয় সইলুম।

—না, না, না, সয়বার দরকার নেই। এস, এস, খুলে দিই।

(চোখ খুলিয়া দেওয়া)

—বাবা! বাবা! তোমায় দেখ্‌তে পেয়ে আমার চোখ যেন জুড়োলো। এতক্ষণ সব দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম, তোমার মুখ কেবল দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না। সে ভারি কষ্ট!

[খাতাঞ্চির প্রবেশ]

—অঁ্যা, করেছ কি? এরই মধ্যে চোখ খুলে দিয়েছ? দেখ্‌ছনা, এখনো ওর রোগ সারেনি!

—না খাতাঞ্চিমশায়, আর খোকার চোখ বাঁধ্‌তে বল্‌বেন না। ওর চোখ বাঁধ্‌লে মনে হয়, ও যেন আমার নেই;—ওর ঐ চোখের তারার আলো না পেলে আমার ঘর আঁধার হয়ে যায়!

—আচ্ছা, আচ্ছা, এখন থাক। তুমি চ'লে এস—হিসেব দেখ্‌বার সময় হয়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[পাখীর আবির্ভাব]

—ভাই পাখী, তুমি কি আমায় এইবার নিয়ে যাবে?

—সে কি! তুমি যে আমার সঙ্গে গিয়েছিলে।

—কৈ, কখন্? টের পাইনি ত!

—মনে পড়্ছে না?—সেই যে তুমি যখন নামতা পড়্তে পড়্তে ঘুমিয়ে পড়্লে!

—হ্যাঁ। হ্যাঁ, একটা স্বপ্ন দেখেছিলুম বটে।

—সে স্বপ্ন নয়—সে সত্যি!

—সত্যি?

—হাঁ। আমার সঙ্গে যাওয়া-আসা ঐ রকম স্বপ্নের মতোই ঠেকে।

—সত্যি? সত্যি? তা হ'লে যা দেখেছি, সব সত্যি?

—সব সত্যি!

—কিন্তু ভাই পাখী, এ কি হ'ল? যা দেখ্লুম, সব ঠিক-ঠিক মনে পড়্ছে; কিন্তু কিছুই মুখে আস্ছে না কেন?

—সে যে ভাই, বল্ব বল্লেই বলা যায় না।

—তবে বাবাকে বল্ব কি ক'রে?

—ভাবচ কেন? বলা তোমার আপনিই ফুটে উঠ্বে—ফুল যেমন ক'রে ফুটে ওঠে!

—কিন্তু ভাই পাখী, এবার যে-দিন নিয়ে যাবে,

অমন আচম্‌কা নিয়ে যেয়ো না, একটু জানিয়ে দিয়ো।

—তা হ'লে হয় ত যাওয়াই হবে না।

—নইলে যে ভাই বুঝ্‌তে পারি না, তোমার সঙ্গে সত্যি যাচ্ছি কি-না ;—স্বপ্ন ব'লে মনে হয়।

—বুঝ্‌তে গেলে যে সময় থাকে না ভাই ; বোঝ্‌-বার সময়ের ফাঁকে যাবার সময়টুকু পালিয়ে যায়।

—আচ্ছা ভাই পাখী, তুমি যে নিয়ে গেলে, সে ত কেবল পথে-পথেই বেড়ালে—কোনো জায়গায় ত নিয়ে গেলে না।

—কোনো জায়গায় যেতে গেলেই যে যাওয়া থেমে যায় ;—আমি ত কোথাও থেমে থাকৃতে পারি না।

—তবে কি কেবল পথে-পথেই ঘুরবো ? কোনো জায়গা আমার দেখা হবে না ?

—সমস্তই যে পথ—জায়গা ত আলাদা ক'রে নেই।

—আচ্ছা ভাই পাখী, আবার কবে নিয়ে যাবে ?

—তা ত বল্‌তে পারি না।

[পদশব্দ। পাখীর অন্তর্দ্ধান]

[বাপের প্রবেশ]

—বাবা! বাবা! পাখীর সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম।

—কোথায় গিয়েছিলি?

—তা বাবা, আমি বল্‌তে পার্‌ব না। কিন্তু সে ভারি চমৎকার!

—কখন্ গিয়েছিলি?

—তা আমার ঠিক মনে নেই।

—কি দেখ্‌লি?

—সে আমি এখন বল্‌তে পার্‌ব না—পাখী বলেছে, আমার বলা ফুলের মতন আপনি ফুটে উঠ্‌বে।

—খোকা, এ-সব কি আবোল-তাবোল বকৃচ? এই নাও ধারাপাত। নামতা মুখস্থ না হ'লে খাতাঞ্জিমশায় ভারি রাগ কর্‌বেন।

[নামতা পড়িতে পড়িতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িল]

৪

[খাতাঞ্জি ও বাপ]

—খাতাঞ্জিমশায়, খোকা এখনও পাখী পাখী করা ছাড়েনি!

—তুমিই ত বাবা খোকার মাথা খেয়েছ। মনকে হিসেবের লাগামে বাঁধ্‌তে না পারলে সে ত ছুটে ছুটে বেড়াবেই। জমাখরচের কোনো অঙ্কের মধ্যেই তাকে পাওয়া যাবে না, অথচ বাতিল করারও যো নেই। হিসে-বের মধ্যে এমন সমস্যা না ঘটতে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

—কিন্তু খা াঞ্চিমশায়, আমিও ত হিসেব শিখিনি।

—তুমি শেখনি বটে, কিন্তু হিসেবের প্রতি এবং বিশেষ ক'রে হিসেব-রক্ষকের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আছে। অবশ্য, সে তোমার বিষয়ী পিতৃপুরুষের পাকা বুদ্ধির ফল। কিন্তু বাবা, তোমার ছেলের জন্যে ত কোনো পাকা ব্যবস্থাই করলে না।

—কি জানেন খাতাঞ্চিমশায়, ছেলেটাকে মোহরের থলির মধ্যে পূরে সিন্দুকে বন্ধ রাখ্‌তে আমার মন কেমন করে। মনে হয়, ছেলেটা বেশ নিরাপদে জমা রইল বটে, কিন্তু সে সিন্দুকেরই সম্পত্তি হ'ল—আমার হ'ল না।

—ঐ ত বাবা, তোমার মস্ত ভুল। সিন্দুকে থাকাই ত থাকা—যখনি খুসি মিলিয়ে দেখ, ঠিক আছে। নইলে

বাইরে, যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে রাখলে হিসেব মিল্‌বে কি ক'রে?

—তা ঠিক বটে, কিন্তু তবু—

—ঐ ত বুটুকু তোমার হিসেব না-জানার কুফল।

—তা ব'লে ছেলেকে আদর করব না?

—আদর কেন করবে না? অত যে যত্ন ক'রে সন্তর্পণে বেঁধে-ছেঁদে রাখা, সে কি আদর নয়? আসল আদর ত তাকেই বলি।

—খাতাঞ্জিমশায়, বল্‌ছেন বটে ঠিক, কিন্তু মন মান্‌ছে না।

—সে তোমার মনে হিসেববুদ্ধি পাকেনি ব'লে।

—ও-সব কথা যাক্‌! এখন আমার খোকাকে রক্ষা করি কি ক'রে বলুন।

—ঐ ত বাবা, আবার ঘুরিয়ে সেই কথাই আন্‌লে! বাইরে আল্‌গা রাখ্‌লেই তার মুস্কিল আছে। বাইরের ত সীমা নেই যে, তার সমস্তটা তলিয়ে পাবে! যে সর্ব্বদা বাইরে ছড়িয়ে থাক্‌বে, তাকে হিসেবের মধ্যে বাঁধ্‌বে কি ক'রে?

—খাতাঞ্জিমশায়, ওসব হিসেবের কথা এখন রাখুন—ছেলেকে যেন না হারাই।

—হারিয়ে ব'সে আছ—আর না-হারাই।

—না খাতাঞ্জিমশায়, ও কথা বল্‌বেন না; আমি অন্তর থেকে বুঝ্‌চি, তাকে হারাইনি।

—পেলেই না, তা আবার হারাবে।

—পেয়েছি বৈ কি—খুব পেয়েছি—পাওয়ার আনন্দে আমার হৃদয় ভরে আছে।

তোমার ও হৃদয়ের পাওয়ার কোনো মানে নেই; তা হ'লে বল না কেন, সমস্ত বিশ্বটা তোমার পাওয়া হয়ে গেছে—তুমি তার সম্রাট্।

—সে কথা কি কেউ বল্‌তে পারে না মনে করেন খাতাঞ্জিমশায়?

—মুখে বল্লেই ত হবে না!—হিসেব দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

—তা আমার সাধ্যে নেই।

—তবে চুপ ক'রে থাক। এত করেও তোমায় হিসেবের মর্ম্ম বোঝাতে পারলুম না!

—রাগ করবেন না খাতাঞ্জিমশায়।

—রাগ করা আমার স্বভাব নয়—রাগের মাথায় অনেক বাজে-খরচ হয়ে যায়, আমার জানা আছে।

—তা হ'লে খোকার সম্বন্ধে—

—সে আমি ভেবে রেখেছি।

—কি ভেবেছেন, বলুন না।

—আমাকে এমন বেহিসেবী পাওনি যে, তোমার মতন আল্‌গা লোকের কাছে ফাঁস ক'রে দিয়ে আমার সব হিসেব ওলট-পালট ক'রে ফেল্‌ব!

—আচ্ছা, আমার শোন্‌বার দরকার নেই; কিন্তু আমার ছেলে —

—তার জন্যে ভাবনা নেই। হিসেবের জালে এমন ফাঁক নেই যে, তার মধ্যে কেউ গ'লে পালায়! দুয়ে দুয়ে চার হতেই হবে।

—শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

—কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতুম, যদি তুমি হিসেব শিখ্‌তে। আমি ত আর চিরদিন থাক্‌ব না ক্ষণস্থায়ী আমাকে এমন ক'রে আঁক্‌ড়ে থাক্‌লে কি হবে?

তার চেয়ে যদি চিরস্থায়ী হিসেবকে আঁকৃড়াতে পারতে, তোমার মঙ্গল হ'ত।

—যাই, একবার খোকাকে দেখে আসি।

[প্রস্থান।

আরে, চল্লে কোথায়? এখন যে খাতা দেখ্‌বার সময়। [খাতায় মনোনিবেশ]

৫

[দূরে বালক ও পাখীর কথোপকথন]

[খাতাঞ্চির প্রবেশ]

—হিসেব ঠিক করা চাই, হিসেব ঠিক করা চাই— পাখীটা কখন্ আসে, কখন্ যায়, তার হিসেব রাখ্‌তে না পারলে সব ফেঁসে যাবে।...কিন্তু পাখীর তো যাওয়া-আসার কোনো হিসেব দেখ্‌ছি না...নিশ্চয় একটা নিয়ম আছে—এই খামখেয়ালির মধ্যেও নিশ্চয়ই একটা নিয়ম আছে—সেই হিসেবটি বা'র করতে না পারলে কার্য্যোদ্ধার হবে না। আমি সব টুকে টুকে রাখ্‌ছি—মাপজোক ঠিক ক'রে নিয়েছি; সে সব সাজিয়ে গুছিয়ে বসিয়ে

আমি নিয়মটা ধ'রে ফেল্‌বই। আমার চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত! [খাতা খুলিয়া গম্ভীরভাবে মনোনিবেশ]

[দূরে চীৎকার]

—ভাই পাখী, ভাই পাখী—সে বেশ হবে! বেশ হবে!

[শব্দে খাতাঞ্চির মন বিক্ষিপ্ত হইল

—নাঃ, এমন গোলমাল হ'লে সব ঘুলিয়ে যায়—পাখীর হিসেবটা প্রায় ঠিক ক'রে এনেছিলুম। যাক, আবার দেখি। [খাতায় মনোনিবেশ]

[দূরে আবার চীৎকার]

নাঃ। এখানে দাঁড়িয়ে হিসেব চল্‌বে না।—যত বেহিসেবীদের গোলমালে সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে।

[প্রস্থান]

[বাপের প্রবেশ। পাখীর অন্তর্দ্ধান]

—বাবা, বাবা! পাখীকে এত ক'রে বল্লুম যে, চল্ না ভাই, বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবি—সে কিছুতে শুনলে না।

—তাই ত খোকা, তোমার বন্ধুকে একবার দেখালে না?

—আমার ত ভারি ইচ্ছে, কিন্তু পাখী যে আসে না।

—সে বোধ হয়, আমায় দেখে ভয় পায়।

—ভয় পায় না বাবা! সে বলে, এখন নয়—একদিন তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হবে। বাবা, তুমি দুঃখু কোরো না, আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার দেখা হবেই।

—আচ্ছা খোকা, তোমার বন্ধু তোমায় ভালোবাসে?

—খুব ভালোবাসে বৈ কি! সে যে আমার বন্ধু।

—আমার চেয়ে সে ভালোবাসে?

—তার ভালোবাসা ঠিক তো তোমার মতন নয়!

—আচ্ছা, তুমি তাকে বেশি ভালোবাস? না, আমায় বেশি ভালোবাস?

—তাকেও বেশি ভালোবাসি; তোমাকেও বেশি ভালোবাসি।

—সে তোমায় ভুলিয়ে নিয়ে যাবে না ত?

—সে বলে, সে ত কাউকে কোথাও নিয়ে যায় না ;—ইচ্ছে হ'লেই তার সঙ্গে যাওয়া হয়।

—আচ্ছা বাবা, আমাকে ছেড়ে তোমার যেতে ইচ্ছে হয়?

—তা ঠিক বুঝ্‌তে পারি না বাবা; একবার যেন হয়, একবার যেন হয় না।

—খোকা, তোমার মনের কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারলুম না।

—আমারও বাবা, মনে হচ্ছে, আমি যেন ঠিক বল্‌তে পারছি না।

(খাতাঞ্চির প্রবেশ)

—চ'লে এস, চ'লে এস—অনেক হিসেব এখনো বাকি প'ড়ে আছে।

—খাতাঞ্চিমশায়, আজ আপনার চোখ দেখে আমার কেমন ভয় করছে। আপনার মনে কি আছে, জানি না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পাখী না পেলে খোকা বাঁচ্‌বে না। সে বুনো পাখী, কখন্ উড়ে কোথায় চ'লে

যাবে, ঠিক নেই ;—খোকা আমার হেদিয়ে মারা যাবে।

—তোমাকেও পাখী-রোগে ধরেছে দেখ্‌ছি।

—না খাতাঞ্চিমশায়, আপনার পায়ে পড়ি—

—কি কর্‌তে চাও তুমি ?

—আমি বলি, কোনো ব্যাধ ডেকে পাখীটাকে ধ'রে খাঁচায় পুরে খোকার কাছে রাখুন। তা হ'লে খোকাও থাক্‌বে, পাখীও থাক্‌বে।

—তা হ'লে পোয়া-বারো আর কি ! আচ্ছা, খোকা থাক্‌বে না হয় মান্‌লুম, কিন্তু পাখী থাক্‌বে কি ক'রে জান্‌লে ?

—লোহার খাঁচা—

—লোহার জোর তোমার জানা থাক্‌তে পারে—কিন্তু ঐ অচেনা পাখীর জোর কি তুমি জান ? যতক্ষণ না তা ঠিক জান্‌ছ, ততক্ষণ বল্‌তে পার না, পাখীকে খাঁচায় আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বে কি না। এ সব হিসেবের কথা, তুমি বুঝবে না। এখন চ'লে এস।

—আচ্ছা, চলুন।

—তা হ'লে খোকাকে ধারাপাতখানা—

—হ্যাঁ বাবাখোকা, তুমি এই ধারাপাত নিয়ে নামতা মুখস্থ কর।

[নামতা পড়িতে-পড়িতে খোকা ঘুমাইয়া পড়িল]

৩

[দূরে খোকা ও পাখীর অস্পষ্ট কথোপকথন]

[খাতাঞ্চি ও বাপের প্রবেশ]

—খাতাঞ্চিমশায়, আমার কেমন ভয়-ভয় করছে।

—থাম। এখন গোল কোরো না। এই যে চিহ্নটা রয়েছে, এইখানে বাঁ পা, আর এই চিহ্নের উপর ডান পা রেখে সোজা দাঁড়াও। পূবদিকে একটু ঘাড় হেলিয়ে দাও—না না, অতটা নয়। এই রোসো, মেপে দেখি। হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। দেখো, নোড়ো না। খবরদার! (আবরণের ভিতর হইতে বাহির করিয়া)—এই নাও!

—এ কি!

—বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট কোরো না—হিসেব

ক'রে দেখেছি—নষ্ট করবার মতো সময় অল্পই হাতে আছে।

—আমার বুক কেমন কাঁপচে।

—চোপ্! স্থির হয়ে দাঁড়াও। পাখীর বুকের ঠিক মাঝখানটিতে লক্ষ্য করো। ঠিক তোমার কান অবধি ছিলে টান্‌বে, তার এক-চুল বেশীও নয়, কমও নয়। নাও। দেখো, ভুল কোরো না।

—খাতাঞ্চিমশায়, কাকে মারতে বলছেন?

—ঐ পাখী। দেখতে পাচ্চ না? ঠিক ক'রে লক্ষ্য কর।

—কৈ, না! পাখী ত দেখছি না—ও ত খোকা।

—ঐ যে খোকার বুকের উপর ডানা মেলে আছে। ভয় নেই—ও তীর পাখীর বুক বিঁধে এক চুলও বেশী যাবে না—হিসেব ক'রে ছিলে বাঁধা আছে। পাখী দেখচ?

—কৈ না! ও ত খোকা!

—তার বুকের কাছে?

—খোকা!

—ভালো করে দেখ।

—ঐ তো কেবল খোকা।

—দাও, দাও, আমার হাতে ধনুর্ব্বাণ দাও। তোমার কর্ম্ম নয়

[নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঠিক হইয়া দাঁড়াইয়া খাতাঞ্জি তীর ছুড়িল। তীর বালকের বুকের কাছে পৌঁছিতেই পাখী মিলাইয়া গেল; বালক তীর-বিদ্ধ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।]

—খাতাঞ্জিমশায়, এ কি কর্‌লেন? আমার খোকার এ কি হ'ল?

—তাই ত—এ কি হ'ল!—এ ত হবার নয়! তবে কেমন ক'রে হ'ল! হবার নয়, তবু কেমন ক'রে হ'ল! আমার পাকা হিসেব পণ্ড হল কি করে!

[হঠাৎ পাখীর আবির্ভাব]

[বাপ বিস্ময়ে পাখীর পানে চাহিয়া রহিল]

ভূতগত ব্যাপার

ছেলেবেলা হইতে আমার আশ্চর্য্য-রকমের ভূতের ভয়। সাম্নাম্নে এম-এ পাশ করিয়াছি, তবু ঐ ভয় ছাড়ে নাই। বলিতে লজ্জা করে, এই বুড়ো-বয়সে এখনও রাত্রের অন্ধকারে একা থাকিলে গা-ছম্‌ছম্‌, বুক-ঢিপ্‌ঢিপ্‌ প্রভৃতি যতগুলো ভয়াত্মক ব্যাধি আছে, সবগুলো এক-সঙ্গে আমাকে আক্রমণ করে। কখন্‌ এবং কোথায় আমাকে ভূতের ভয় পাইয়া বসে, তার কিছুই ঠিক নাই!

হয় ত এই ভূতের ভয় বয়স এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া যাইত, কিন্তু কাল করিয়াছে ঐ বিলাতের ভূতুড়ে-সভা—সাইকিকাল রিসার্চ্চ সোসাইটি! এখন ত দেখিতেছি, বিলাতে হেন নামজাদা লোক নাই—যিনি ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করেন। যাঁহাদের জ্ঞানের একটু টুক্‌রামাত্র লইয়া বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি

লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছি, যখন দেখি, তাঁহারাও আমার দলে তখন আমার ভূতের ভয় যে আরো সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে, আশ্চর্য্য কি !

আমার বিশ্বাস, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, পৃথিবীর সকল লোকের মনেই ভিতরে-ভিতরে সমান ভূতের ভয় আছে। কেহ মুখ-ফুটিয়া কবুল করে, কেহ লজ্জায় বলিতে না পারিয়া দম-ফাটিয়া মরে। যাহা হৌক, এখন ভূতুড়ে-সভার দৌলতে বিজ্ঞানের কাপড় পরাইয়া ভূতের ভয়টাকে সভ্যসমাজে বাহির করিবার আয়োজন হইতেছে। তাহাতে ভূত-ভয়ের লজ্জা হইতে সভ্য মানুষ পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিবে। কারণ ভয়কে গোপনে চাপিয়া রাখা শরীর, মন উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক।

তবে জয় হৌক সাইকিক্যাল রিসার্চ্চ সোসাইটির ! যদি তাঁহাদের বেহায়ামির পরোয়ানা না পাইতাম, তাহা হইলে আজ যেসব কথা বলিতে বসিয়াছি, তাহা কি এত লোকের সামনে এমন অসঙ্কোচে বলিতে পারিতাম! আমার ত এ অতি নগণ্য ব্যাপার এর চেয়ে আরো আজগুবি কত ভূতুড়ে কাণ্ড, বিলাতের ভৌতিক

সভার মাননীয় সভ্যেরা আজকাল কাগজে-কলমে জাহির করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

ভূতের ভয় জীবনে অনেকবার পাইয়াছি, কিন্তু সেবারের মতন তেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার কাহারো অদৃষ্টে কখনো ঘটিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। সে-কথা মনে করিতে এখনো গা-ছম্‌ছম্‌ করে। যাঁহাদের ভূতের ভয় প্রবল, গোড়া হইতে বলিয়া রাখি, তাঁহারা কানে আঙুল দিন। কারণ, এই গল্প শুনিতে-শুনিতে বুক-ঢিপ্‌ঢিপানি প্রবল হইয়া যদি কাহারো হার্ট-ডিসিস্‌ হয়, তজ্জন্য আমি দায়ী হইতে পারিব না। বুড়ো মারিয়া খুনের দায়ে পড়িবার ভয় আমার নাই। আমার ভয়, পাছে তাঁহারা ভূত হইয়া কোনো ঘোর নিশীথে আমার সহিত রসিকতা করিতে আসেন!

যাক, এখন আসল কথা। সে-বৎসর পূজার ছুটীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। বাড়ী হইতে এই আমার প্রথম বিদেশ-যাত্রা। সঙ্গে ছিল আমার বাল্য-বন্ধু শ্রীশ। ছেলেবেলা হইতে দেখিতেছি, শ্রীশ লোকটার আশ্চর্য্য সাহস। তাহার প্রাণে ভূতের ভয় একেবারে

নাই। সে বলে, রাত্রের অন্ধকারে সে একলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দিব্য ছাদে বেড়াইতে পারে; ঘোর নিশীথে অশথ কিংবা বেলগাছের তলা দিয়া যাইতে তার এতটুকু গা-ছম্‌ছম্‌ করে না; পোড়ো-বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া সে বেশ গট্‌-গট্‌ করিয়া চলিয়া যায়, এবং এমন কি, সে ভূত কখনো দেখে নাই, এ কথা দিবা-দ্বিপ্রহরে সকলের সমক্ষে চীৎকার করিয়া বলিতে এতটুকু সঙ্কোচ করে না।

ভূত লইয়া তাহার সহিত আমার অনেকবার তর্ক হইয়াছে। সে বলে, ভূত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, যেহেতু, ঘাড় মটকা-ইতে হইলে যে হাতের দরকার, তাহা তাহাদের নাই; এবং তাহারা ঘাড়ে চাপিলে ক্ষতি কি, যখন তাহাদের দেহের কোনো ভারই নাই। আমার মত কিন্তু অন্য রকম। আমি বলি, ভয় যদি না থাকে, তবে ভূতও নাই। ভয়টাকে বাদ দিয়া শুধু ভূতটাকে রাখা একটা জঘন্য কুসংস্কার মাত্র। মোট কথা, শ্রীশের সঙ্গে তর্ক করিয়া কোনো লাভ হয় নাই। কারণ, শ্রীশের যুক্তি-তর্কে আমার ভূতের ভয় একতিলও কমে নাই এবং

আমার ভৌতিক গবেষণার দ্বারা তাহার মনে এতটুকু ভূতের ভয় সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি নাই। সে আমার ভূতের ভয় লইয়া আমাকে ঠাট্টা করিত। আমি জবাব দিতে না পারিয়া রুদ্ধ আক্রোশে মনে-মনে বলিতাম, 'রেসো না, বাছাধন, ভূত মানো না, একদিন টের পাবে এখন!' কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এত দিন চলিয়া গেল, তবু ঐ বাছাধন এখনো কিছুই টের পাইলেন না। ভূতের মধ্যেও কাপুরুষ আছে না কি! কোনো সাহসী ভূত শ্রীশকে এখনো সায়েস্তা করিল না দেখিয়া, চুপি-চুপি বলি, আমার মন এক-এক সময় ভূতের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বিশেষ সংশয়ী হইয়া উঠে। মনের কথা বলিয়া ফেলিলাম, আজ অন্ধকার রাত্রে অদৃষ্টে কি আছে, জানি না!

এমন জানিলে শ্রীশের সঙ্গে কখনোই দেশভ্রমণে বাহির হইতাম না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের বাতিক তার যে এতদূর চাগাইয়াছে, তাহা জানিতাম না। যেখানে যাই, সেখানকার প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস লইয়া সে আলোচনা আরম্ভ করে, আর তার কথা শুনিতে-শুনিতে

আমার সমস্ত বুকখানা দুরদুর্‌ করিয়া উঠে। তাহাকে থামিতে বলিতে পারি না; কারণ, আমার মতো বুড়ো-ধাড়ির দিন-দুপুরে আঁৎকানি কি লোকের কাছে মুখ-ফুটিয়া বলিবার মতন! ইতিহাসের গল্প বইয়ে ঢের পড়িয়াছি, কিন্তু এই যে মৃত ঐতিহাসিক স্থানগুলো, ওর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ওর কাহিনী শুনিতে শুনিতে কেন যে এমনতর গা-ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠে, বুঝিতে পারি না। ঠিক মনে হয় যেন, প্রেতভূমি-শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছি!

আমার মুখ শুক্‌নো দেখিয়া শ্রীশ একদিন বলিল, "বাড়ীর জন্যে মন-কেমন কর্‌ছে বুঝি?"

আমি কাষ্ঠ-হাসি মুখে আনিয়া বলিলাম—"না হে না! আমি কি এম্‌নি অপদার্থ?"

শ্রীশ বলিল—"তবে মনটা যে চঞ্চল দেখ্‌ছি?"

আমি কোনো উত্তর করিলাম না। মনের কথা মনেই রহিল।

বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা প্রভৃতির মন্দির দেখা শেষ করিয়া শ্রীশ বলিল—"চল সারনাথে!" পথে সে আমাকে সারনাথের ইতিহাস শোনাইয়া দিল। তখন খুব ফূর্ত্তির

সঙ্গে তার কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু যেমন সেই মাটি খুঁড়িয়া বাহির-করা সারনাথের প্রাচীন সহরের উপর দৃষ্টি পড়িল, অমনি কি-জানি-কেন, আমার বুক দুর্‌দুর্ করিয়া মনে হইল যেন, একটা প্রকাণ্ড সহর-ভূত কবর ঠেলিয়া আমার দিকে উঁকি মারিতেছে। তার অন্ধকারের মধ্যে ভয়ে ভয়ে চোখ চাহিয়া দেখিলাম, কতকগুলো কন্ধকাটা মূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলো হাত-পা ভাঙা লোক যেন সবেমাত্র মাটি ঠেলিয়া উঠিয়াছে, আরও-কতকগুলো মাটির ভিতর হইতে বাহির হইবার জন্য সজোরে ঠেলা মারিতেছে। হঠাৎ দেখি, মুণ্ডিত-মস্তক, গেরুয়া-বসন-পরা মেয়ে-পুরুষের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে—সকলকারই শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, সংযত দৃষ্টি, সংহত আচরণ! হাতে-হাতে নানা-রকম ভিক্ষাপাত্র। ছোট ছোট কুঠরীর অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া কাহারা সব মালা ঘুরাইতেছে, শাস্ত্র পড়িতেছে, গান গাহিতেছে।

একস্থানে বুদ্ধদেব তাঁহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। কত দিন পরে আজ তাঁহার দেহের উপর সকালবেলাকার সূর্য্যের আভা

আসিয়া লাগিয়াছে, তবু তাঁহার ঘুম ভাঙিবার সময় হয় নাই। কত যুগ চলিয়া গেল, কত লয়-বিলয় ঘটিয়া গেল, মাটি পাথর হইয়া গেল, পাথর ভাঙিয়া ধুলা-গুঁড়া হইয়া গেল, তাঁহার নিজের দেহও পাথর হইয়া গেল, তবু তাঁর সমাধি-ভঙ্গ হইল না। সেই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আমার গা-ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল— যদি এখনি গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়! আশে-পাশে দেখিলাম, আরো কত-শত দেব-দেবী নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের এমন ভাবভঙ্গী যে, কখন্ যে তাঁহাদের খেয়াল হইবে আর জাগিয়া উঠিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন, তার ঠিক নাই। চতুর্দ্দিকে যাদের দেখিতেছি, এরা সবাই যদি একসঙ্গে মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া কলরব করিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা অপরিচিত দুটি ক্ষুদ্র দর্শক এঁদের মধ্যে যে কোথায় হারাইয়া যাইব, কেহ খুঁজিয়াও পাইবে না। হয় ত এদের সঙ্গে আবার মাটী-চাপা পড়িয়া কত কাল এইখানে থাকিতে হইবে! আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌-থর্‌ করিতে লাগিল। আমি [illegible]কে টানিয়া লইয়া পলাইয়া আসিলাম।

তার পর আগ্রার দুর্গ। আমি দেখিলাম, সে একটা মস্ত হানাবাড়ী! শ্রীশ তার ইতিহাস মুখস্থ বলিয়া যাইতে লাগিল। এক-একটা স্থান দেখায় আর তার আনুষঙ্গিক গল্প বলিতে থাকে, অমনি হাজার-হাজার সাহজাদা, নবাব-জাদা মাথায় তাজ, হাতে গজদন্তের ছড়ি, পায়ে নপেটা পরিয়া হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া আসে। কত যে বেগম, সাহজাদী ও সখী ওড়না উড়াইয়া সাম্‌নে দিয়া চলিয়া যায়, তার ঠিক নাই।

ঐ অন্ধকার গুপ্ত কক্ষে কি যেন একটা গুপ্ত মন্ত্রণা চলিয়াছে, তার ফিস্‌ফাস্ ফুস্‌ফাস্ শব্দ ভূতের নিশ্বাসের মতো গায়ে আসিয়া লাগিল।...

পরক্ষণেই একটা বিকট-আকৃতি লোক একখানা ধারালো চকচকে ছোরা-হাতে সাম্‌নে দিয়া চলিয়া গেল।...

একটা ক্ষুদ্র ঘরের জানলার ধারে এক পরমা রূপসী হতাশ-মনে আকাশ-পানে চাহিয়া বসিয়া আছে... হঠাৎ দেখি, সে চ্যুতপুষ্পের মতো ঢলিয়া পড়িল, তার সর্ব্বাঙ্গের সোনালী আভা একেবারে নীল হইয়া গেল...

নর্ত্তকীদের পায়ের ঘুঙুরের ঝুম্-ঝুম্ আওয়াজের সঙ্গে মদের পেয়ালায় ঠুনঠুন্ ও সারেঙের ছড়ির মিঠা টানের একটা জটলা কানে আসিয়া লাগিল···আতর-গোলাপের গন্ধের একটা হলকা নাকের সামনে দিয়া চকিতের মধ্যে বহিয়া গেল···হাসির একটা তুফান···আবার একটা মর্ম্মভেদী করুণ দীর্ঘশ্বাসের ঝড়···ঐ না কার নেশায় বিহ্বল জড়িত কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন !···ও কি, ও কার অফুরন্ত করুণ আর্ত্তনাদ !···

হঠাৎ সব নিস্তব্ধ। সারেঙের তার খুব উঁচু পর্দায় উঠিয়া যেন হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল। অমনি গান বন্ধ, ঘুঙুরের আওয়াজ স্তব্ধ···গুপ্তকক্ষের কপাট সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল···বেগম-মহলের জানলায়-জানলায় শত শত জলজলে আঁখি ক্ষণেকের জন্য একটা ভয়মিশ্রিত কৌতূহল-দৃষ্টি হানিয়া একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িল···ঘরে ঘরে জানলা-কপাট বন্ধ। বাদশাহ, বেগম, সাহজাদা, সাহজাদী, কিঙ্কর-কিঙ্করী কে যে কোথায় গেল, আর সন্ধান মিলিল না—

একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণি-ধোঁয়ায় সমস্ত ছাইয়া গেল।

চারিদিকে কেবল কালো কষ্টি-পাথরের মতন অন্ধকার। সেই অন্ধকার-পাথরের ধাক্কায় ধাক্কায় ময়ূরাসিংহাসন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। গগনস্পর্শী প্রাসাদশিখর মাটির উপর সশব্দে ভাঙিয়া পড়িল, সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীরে বড়-বড় ফাট ধরিল, হীরেজহরৎ, মণিমাণিক্য এবং সমস্ত আসবাব-পত্র যেন একটা প্রকাণ্ড কালো হামান-দিস্তায় পড়িয়া গুঁড়া হইতে লাগিল,—তারই ধুলায় চারিদিকের অন্ধকার আরো ঘনাইয়া আসিল। * * * *

আমি চোখে অন্ধকার দেখিয়া প্রায় মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম। হঠাৎ শ্রীশের কণ্ঠ শুনিলাম। সে বলিয়া উঠিল—"তুমি অমন ক'রে শূন্য-দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখ্ছ?"

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলাম—"চল, চল, এখান থেকে পালাই!"

সে বলিল—"কেন?"

আমি বলিলাম—"ভূতের এই উৎপাতে মানুষ এখানে টিঁক্তে পারে?"

শ্রীশ বলিল—"এই দিন-দুপুরে তুমি ভূত দেখ্লে কোথায়?"

আমি বলিলাম—"কোথায় নয়!—চারিদিকে কেবল মামদো ভূত গিস্‌গিস্‌ কর্‌ছে। এখানকার মাটি থেকে দেয়াল, কড়িকাঠ পর্য্যন্ত সব ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে! দেখচ কি? এখন কি আর সেই আসল জিনিস আছে?"

শ্রীশ হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম—"হাস্‌চ বটে, কিন্তু জান না, এ সব বাদশাহী ভূত! এদের খেয়ালের কথা বলা যায় না।—আমাদের নিয়ে এমন ভূতুড়ে রসিকতা কর্‌তে পারে যে—"

শ্রীশ আমার কথায় কান না দিয়া একজন গাইডের সঙ্গে কি-একটা তর্ক জুড়িয়া দিল। আমি উস্‌খুস্‌ করিতেছি দেখিয়া সে আমার পানে চাহিয়া বলিল—"খবরদার, এ দুর্গ থেকে একলা বেরোবার চেষ্টা কোরো না—এমন গোলকধাঁধার মধ্যে পড়্‌বে যে, আর পথ খুঁজে পাবে না।"

আমার শরীরের সমস্ত রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া মাথায় উঠিল। আমার হাত-পা একেবারে অবশ হইয়া আসিল।

......আমি প্রাণপণশক্তিতে দৌড় দিলাম। দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ দেখি, একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। চারিদিক্ অন্ধকার। সাম্‌নের দিকে চলিলে পথ পাই, কিন্তু ফিরিতে গেলেই দেখি, পিছনের পথ কালো পাথরের দেয়ালে বন্ধ। সর্ব্বনাশ! কি করি, সাম্‌নে চলিতে লাগিলাম—কিন্তু পথ ফুরায় না, চলিতে-চলিতে পা অসাড় হইয়া গেল, বসিয়া পড়িলাম, যেমন বসা, অমনি মনে হইল, সাম্‌নে যেন একটা কালো পাথরের দেয়াল পড়িল। হাত বাড়াইয়া দেখি, সাম্‌নে দেয়াল, পিছনে দেয়াল, মাথার উপর দেয়াল, আশপাশে দেয়াল; —দেয়ালগুলো ক্রমেই কাছ-ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল;—ঘাড় উঁচু করিলে মাথায় ঠেকে, পাশ ফিরিলে গায়ে ঠেকে। এ কি আমার জীবন্ত সমাধি হইল নাকি! * *

বাড়ী ফিরিয়া বৈকালিক জলযোগের পর শ্রীশ বলিল—"চল, তাজ দেখিতে যাই।"

আমি বলিলাম—"না!"

শ্রীশ অবাক্ হইয়া বলিল—"সে কি?"

আমি জোর করিয়া বলিলাম—"না, আমি যাবো না!"

সে বলিল—"তবে চল ইৎমৎদৌল্লা!"

আমি বলিলাম—"না!"

—"সেকেন্দ্রা?"

—"না!"

—"তবে চল, যমুনার ধারে ঠাণ্ডা বাতাসে তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসি।"

আমি এ কথার কোনো উত্তরই দিলাম না।

অগত্যা শ্রীশ একলা বাহির হইয়া গেল। আগ্রা দেখা শেষ করিয়া আসিয়া বলিল—"এবার কোথায় যাবে?"

আমি বলিলাম—"বাড়ী!"

সে বলিল—"দূর পাগল! বাড়ী যাবে কি! চল দিল্লী যাই।"

—"সেখানে কি আছে?"

—"দিল্লীর দুর্গ!"

আমি বলিলাম—"উহু।"

—"আচ্ছা বেশ, দুর্গ না দেখ, জুম্মা আছে, কুতুব-মিনার আছে, হুমায়ুন-কবর আছে।"

আমি কবরের নামেই বলিয়া উঠিলাম—"না না, সে সব হবে না।"

এমনিতর তর্ক করিতে-করিতে ট্রেণের সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। শ্রীশ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"তবে কোথায় যেতে চাও, ঠিক ক'রে বল!"

আমি বলিলাম—"দেশ দেখার সখ আমার মিটেছে; এখন ঘরের ছেলে ঘরে চল।"

শ্রীশ খানিকক্ষণ গোঁ হইয়া রহিল। চুপ করিয়া কি ভাবিল। তার পর বলিল—"তবে চল জয়পুর যাই।"

—"সেখানে কি আছে?"

—"শুনেছি, সহরটি দেখ্‌তে খুব ভালো।"

—"প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ সে সহর ম'রে ভূত হয়ে নেই ত?"

—"না হে না।"

—"নবাবদের হানা বাড়ী?"

"আরে না না, সে সব নেই। তোমায় পক্ষে খুব নিরাপদ্ জায়গা।"

আমি বলিলাম—"ঠিক বল্‌ছ ?"

শ্রীশ আমার গায়ে হাত দিয়া শপথ করিল।

ট্রেণ ছাড়িবার অল্পমাত্র বাকি, আর হাঁ-না করিবার বেশি সময় নাই, শ্রীশের কথার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া আমি রাজি হইয়া গেলাম।

গাড়ী ছাড়িলে আমার হঠাৎ মনে পড়িল অম্বরের কথা। আমি বলিলাম—"শ্রীশ, রাস্কেল, মিথ্যেবাদী! জয়পুর তোমার নিরাপদ্ জায়গা ?"

শ্রীশ অবাক্ হইয়া বলিল—"কেন ?"

—"কেন ? অম্বরের প্রাসাদ!—সেটা কি ? সেটা একটা আস্ত ভূতুড়ে বাড়ী!"

শ্রীশ বলিল—"তোমার ভয় নেই, সেখানে তোমায় নিয়ে যাবো না—জয়পুর সহর থেকে সে অনেক দূর!"

জয়পুর ষ্টেশনে যখন ট্রেণ আসিয়া থামিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। কুলির মাথায় মোট

নাপাইয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইতেছি, কুলি বলিল—"কোথায় যাবেন বাবু?"

আমরা বলিলাম—"সহরে!"

সে বলিল—"সহরের ফটক বন্ধ, ঢোক্‌বার যো নেই!"

শ্রীশ ও আমি মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। শ্রীশ বলিল—"তবে চল ওয়েটিং রুমে।"

ওয়েটিং রুমে জিনিসপত্র নামাইয়া সবে মাত্র বসিয়াছি, ষ্টেসন-মাষ্টার আসিয়া বলিল—"এখানে আপনাদের থাক্‌তে দিতে পারি না। রাত্রে আর ট্রেণ নেই—এখনি ষ্টেসন বন্ধ ক'রে আমরা সব চ'লে যাবো!"

শ্রীশ বলিল—"তা যান না। আমরা কি আপনাকে ধরে রেখেছি?"

ষ্টেসন-মাষ্টার বলিল—"আপনাদের বিদেয় ক'রে ঘর চাবি-বন্ধ হ'লে তবে আমরা ছুটী পাব।"

শ্রীশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"সে কি রকম কথা! আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, জানেন!"

ষ্টেসন-মাষ্টার বলিল—"তা জানি। কিন্তু আপনাদের জন্মে আমি দায়ী হ'তে পারব না।"

শ্রীশ বলিল—"আমরা কি 'বুক'-করা মাল যে, আমরা আপনার হেফাজতে থাক্‌বার দাবী রাখি!"

সে বলিল—"ও! ব্যাপারটা আপনারা জানেন না দেখ্‌ছি। সপ্তাহখানেক হ'ল, এই ওয়েটিং রুমে একটা খুন হয়ে গেছে। একটি যাত্রী এসে রাত্রে এইখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই রাত্রেই তিনি খুন হন, তাঁর লাস সনাক্ত কর্‌তে পারা যায়নি, কারণ, তাঁর মাথা খুঁজে পাওয়া গেল না।"

সর্ব্বনাশ!

আমি শ্রীশকে বলিলাম—"চল শ্রীশ, এখান থেকে পালাই!"

শ্রীশ আমার দিকে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া চড়া গলায় বলিল—"সহরের ফটক বন্ধ, এত রাত্রে যাবে কোথা?"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম—"যেখানে হোক চল—এ সর্ব্বনেশে জায়গা ছেড়ে।"

শ্রীশ বলিল—"তুমি যেখানে খুসী যেতে পার—আমি এই রাত্রে নড়ানড়ি করতে পারব না।"

সর্ব্বনাশ! আমি একা এই অন্ধকার রাত্রে কোথায় যাইব? অগত্যা চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু মনের ভিতর ভারি একটা অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। একে এই বিদেশ-বিভুঁই, তাতে এই অন্ধকার রাত্রি, তার উপরে ঘরে খুন হইয়াছে। আমার যেন হাঁফ ধরিতে লাগিল।

শ্রীশকে কাতর কণ্ঠে বলিলাম—"আজ রাত্রের মতো একটা কুলিকে এই ঘরে রাখ হে।"

কিন্তু কোনো কুলি থাকিতে রাজি হইল না।

আমি তখন ষ্টেসন-মাষ্টারের দিকে ছল্ ছল্ চোখে চাহিয়া বলিয়া উঠিলাম—"দোহাই আপনার, আমাদের একটু জায়গা দিন আপনার বাড়ীতে—"

শ্রীশ আমার দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"তুমি আচ্ছা ছেলেমানুষ ত!"

তার কথায় আমি থতমত খাইয়া গেলাম; তার সেই চোখের দৃষ্টিতে আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ষ্টেসন-মাষ্টারের সঙ্গে শ্রীশের তর্ক চলিতেছিল, তার মাথামুণ্ড কিছুই আমার বোধগম্য হইল না, কেবল থাকিয়া-থাকিয়া তর্কের মধ্য হইতে 'মাথা' কথাটা ধাক্কার মতো আমার বুকে আসিয়া লাগিতে লাগিল।

অবশেষে দেখিলাম রণে ভঙ্গ দিয়া ষ্টেসন-মাষ্টার সদলবলে চলিয়া গেল—সমস্ত ঘরটাকে একেবারে শূন্য করিয়া, আমাদের একলা ফেলিয়া! আমি হতাশভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘরের বাতাসের মধ্যে সেই হারানো মাথার কথাটা তখনো ঘোলাইতেছিল।

শ্রীশ বলিল—"রাত্রি অনেক হয়েছে, নাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে শুয়ে পড়।"

আমি ভয়ানক শীতকাতুরে। একে শীতের কাঁপুনি, তার উপরে ভয়ের কাঁপুনি জুটিয়াছে! গায়ে আমার প্রকাণ্ড একটা ওভার-কোট ছিল, তবু আমার ভিতরের হাড়সুদ্ধ কাঁপিতেছিল। আমি বলিলাম—"জামা-কাপড় আমি ছাড়ছি না, এই সবসুদ্ধ শুয়ে পড়ব।"

শ্রীশ ওভার-কোটটা খুলিতে খুলিতে বলিতে

লাগিল—"বাবা! ঐ গাধার বোঝা পিঠে নিয়ে তুমি ঘুমোবে কেমন ক'রে?"

তার পর শ্রীশ আর দ্বিরুক্তি করিল না। যেমন বিছানায় পড়া, অমনি ঘুম। আমি দুবার শ্রীশ শ্রীশ করিয়া ডাক দিলাম, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আমি তখন হতাশ হইয়া গায়ের কম্বলটা মাথা অবধি মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সমস্ত শরীরটা গরম হইয়া উঠিয়া বেশ-একটু আরাম করিতে লাগিল। চোখে তন্দ্রার আবেশ জড়াইয়া ধরিল। আমি অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি, জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুম ভাঙিবার কারণটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মনে হইল, কে যেন গা নাড়িয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিয়াছে। কম্বলটা দেখি মাথা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। দূরে একটা কোণে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু তার চিমনির উপরকার ধোঁয়া ও ধূলা ঢাকিয়া যে আলো বাহির হইতেছিল, তাহা অত্যন্ত ঘোলাটে। চারিদিক্ হইতে ঘোর অন্ধকার ঘরের মধ্যে

ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল। কণ্ঠনের ক্ষীণ আলো জমাট অন্ধকারের গায়ে সামান্য একটু আভা ফেলিতেছিল মাত্র, তার গভীরতা ভেদ করিতে পারিতেছিল না,—তার কঠিন গায়ে লাগিয়া আলোর তীরগুলো প্রতিহত হইয়া যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়িতেছিল।

শ্রীশকে ঠিক দেখিতে পাইতেছিলাম না,—কোথায় সে শুইয়া আছে, তারই একটা আন্দাজ পাইতেছিলাম মাত্র। আমাদের জিনিসপত্রগুলো কালো-কালো ছোটো-ছোটো ঢিবির মতন চারিদিকে ছড়াইয়া ছিল। কোথাও এক-জায়গায় আমাদের একটা পুঁটুলি হইতে একটু সাদা কাপড়ের অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। মনে হইল যেন ঐ অন্ধকারটা তার সাদা দাঁতের পাটি বাহির করিয়া ভ্রূকুটি করিতেছে। আমার মাথাটা বোঁ করিয়া উঠিল; চোখে অন্ধকার দেখিলাম। তাড়াতাড়ি কম্বলটা আবার মাথা অবধি টানিয়া চোখ বুজিয়া অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিলাম। একটু পরেই ভয়ঙ্কর গরম বোধ হইতে লাগিল। কপালে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। মাথা অবধি কম্বলমুড়ি অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি সেটা

টানিয়া ফেলিয়া দিলাম। দেখি, চারিদিকে অন্ধকারের খেলা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে;—কোনোখানটার অন্ধকার ঘোর জমাট, কোনোখানটার পাতলা; কোথাও পাথরের মতন কঠিন ভারি, কোথাও মেঘপুঞ্জের মতো হাল্কা ফুর্-ফুরে। কোনো জায়গা কালির মতো মিশ-কালো, কোনো জায়গা ছাইয়ের মতো ফিকে পাঁশুটে।—চারিদিকে কেবল কালো রঙের নানা স্তর—নানা বৈচিত্র্য। ঘরের মধ্যে যেসব জিনিস ছড়ানো আছে, সেগুলোকে আর বস্তু বলিয়া মনে হয় না, সেগুলো যেন অন্ধকারেরই কাচ্ছা-বাচ্ছা। উপরে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া দেখি কয়েকটা অন্ধকার-জীব বিছানা পাতিয়া ছেলেপুলে লইয়া শুইয়া আছে। দেয়ালের দিকে দেখি, তার গায়ে বড়-ছোটো নানা-রকমের সব নির্জীব ছায়ার পোকামাকড় লাগিয়া আছে। এ যেন ছায়াবাজির অন্ধকারের রাজত্ব;—এখানে যেন রক্তমাংসের সম্পর্ক নাই। * * *

হঠাৎ চেয়ারের উপর নজর পড়িল; সেখানে দেখি, একটা লোক অলসভাবে বসিয়া আছে—তার হাত-দুটো চেয়ারের হাতা হইতে ন্যাতার মতো ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

একবার মনে হইল, বুঝি শ্রীশ চেয়ারে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি ডাকিলাম—"শ্রীশ!" কোনো উত্তর পাইলাম না। কেমন সন্দেহ হইল। শুইয়া শুইয়া খুব ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখি—এ কি! লোকটার মাথা নাই যে! কাঁধ অবধি শরীরটা গিয়া—ব্যস, সেইখানেই একেবারে শেষ হইয়া গেছে। আমার সমস্ত শরীর ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল —আমি তাড়াতাড়ি কম্বলটা আবার মাথা অবধি টানিয়া চোখ বুজিয়া রহিলাম। * * *

মনে হইল, লোকটা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—যেন ধীরে ধীরে আমার দিকে আসিতেছে। আমার সমস্ত শরীরটা গুটাইয়া একেবারে কুণ্ডলী পাকাইয়া গেল। আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া কে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। সে নিশ্বাসের বাতাস কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা! কম্বল ফুঁড়িয়া আমার ভিতরের হাড় ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপাইতে লাগিল। লোকটা সাপের নিশ্বাসের মতো হিস্-হিস্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার মাথা কৈ? —আমার মাথা!" * * *

মনে হইল যেন, একখানা হাত আমার মাথাটাকে পরীক্ষা করিতেছে—ভালো করিয়া এদিক্-ওদিক্ ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখিতেছে। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। গলা হইতে কোনো স্বর বাহির হইল না। এমন অসাড় হইয়া গেলাম যে, বোধ হইল যেন, আমার বুকের কাঁপুনি পর্য্যন্ত থামিয়া গেছে। তখন আড়ষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিলাম, দুখানা হাত কেবল চারিদিক্ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে আর একটা অস্ফুট শব্দ উঠিতেছে—মাথা কৈ? মাথা কৈ? * * *

ঢং ঢং শব্দে সমস্ত দিক্ কাঁপাইয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কম্বল ফুঁড়িয়া একটা আলোর রেখা আমার চোখের পাতায় আসিয়া লাগিল। ওয়েটিং রুমের বাহিরে একটা কলরব উঠিয়াছে। শ্রীশ আমার নাম ধরিয়া অনবরত চীৎকার করিতেছে—"ওঠ হে, ওঠ, সকাল হয়েছে।"

আমি কম্বল হইতে এতটুকু মুখ বাহির করিয়া চাহিলাম। ঘরের দরজা-জানলা তখনো বন্ধ, ভোরের অল্পমাত্র আলো দেখা দিয়াছে। সেই আলো-আঁধারের মধ্যে দেখিলাম, শ্রীশ চেয়ারখানার সামনে দাঁড়াইয়া

আছে। তার দিকে চাহিতেই মনে হইল, রাত্রের সেই কন্ধকাটা লোকটা যেন শ্রীশের গায়ের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল। আমি চোখ বুজিয়া ফেলিলাম। তার পর দেখি, শ্রীশ ওভারকোট আঁটিয়া আমাকে ঠেলাঠেলি করিতেছে।

ঋণ-শোধ

অদৃষ্টের ফেরে কিউস্থুকিকে দাস্তবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সে যে নিতান্ত গরীবের ছেলে ছিল, তাহা নহে; তাহার বাপ এমন সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন যে, চাকরী না করিলেও তাহার দিন চলিত; কিন্তু সে যখন খুবই ছোটো, তখন বাপের মৃত্যু হওয়াতে তাহার দাদার হাতে বিষয় আসিয়া পড়ে;—দাদা সেই বিষয় দুইদিনে ফুঁকিয়া দেয়—তাহার বদখেয়ালেতে বিষয়পত্র সমস্ত বিক্রয় হইয়া শেষে বসতবাড়ী পর্য্যন্ত বাঁধা পড়ে।

তাহাতেও তাহার দাদার চোখ খোলে নাই। উচ্ছৃঙ্খলতার নেশা তাহাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছিল যে, শেষে চুরিচামারি করিয়া তাহাকে সখ মিটাইতে হইত। চোরের কলঙ্ক-কালিমা মুখে মাখিয়া তো সমাজে বাস করা চলে না,—কাজেই জেল হইতে মুক্তি পাইয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। গ্রামের সকলে তাহাতে নিশ্চিন্ত হইল; তাহারা বলিতে লাগিল—আঃ, আপদ্ গেছে! কিন্তু মায়ের প্রাণে যে কি হইতে লাগিল, তাহা মা-ই জানেন! তিনি দিন-রাত ধুলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এখন সমস্ত সংসারের ভার একা কিউস্থকির উপরে। সে ছেলেমানুষ, যেন অকূল পাথারে পড়িল;—দু-বেলা দু-মুঠা খাওয়ার কথা দূরে থাকুক, মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটি পর্য্যন্ত নাই। কাজেই তাহাকে চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল। অনেক কষ্টের পর দূরগ্রামে একটা চাকরি জুটিল। সে মা ও বোনটিকে দেশে রাখিয়া চাকরি-স্থানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় মা তাহার হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন—"দেখিস্ বাবা!

তোর দাদার কথা যেন ভুলে থাকিস্‌নে—আহা, বাছা-আমার কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে!” বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ দিয়া টস্‌-টস্‌ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কিউঙ্কি মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—“কিচ্ছু ভেবো না মা তুমি! আমি দাদাকে ঠিক তোমার কাছে এনে দেবো।”

কিউঙ্কি মায়ের কাছে একথা বলিয়া আসিল বটে, কিন্তু দাদার খোঁজ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। সে সমস্ত দিন কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকে; কখন্ সে খোঁজ লয়—আর কোথায়ই বা খবর করে! থাকিয়া-থাকিয়া, মাঝে-মাঝে, দাদার জন্য মায়ের শোকের কথা তাহার মনে পড়িত—তাহাতে তাহার প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু কি করিবে? উপায় নাই! সে ভাবিত, যদি এমন দিন কখনো আসে যে, পরের দাসবৃত্তি করিতে না হয়, তাহা হইলেই সে দাদার খোঁজ করিতে পারিবে—মায়ের দুঃখ মোচন করিতে পারিবে—নইলে ইহজন্মে নয়।

কিউঙ্কির মনিব কিউঙ্কিকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। আহা! বড়-ঘরের ছেলে দুঃখে পড়িয়া

চাকরি করিতে আসিয়াছে, এই মনে করিয়া তাঁহার চিত্ত সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত ;—যাহাতে কিউসুকির ভালো হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। অবসর-সময়ে কিউসুকি যে সকল কাজ করিত, তাহার জন্য তিনি আলাদা পারিশ্রমিক দিতেন—তাহা ছাড়া বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম-উপলক্ষে অন্যান্য চাকরদের চেয়ে কিউসুকির পাওনাটা বেশি হইত। এমনি করিয়া মা-বোনের খাওয়া-পরা চালাইয়াও কিউসুকির মাসে-মাসে কিছু জমিতে লাগিল।

কিউসুকি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিল, এক হাজার টাকা হইলেই তাহার বন্ধকী বাড়ী ও জমীজমা সব উদ্ধার হয়। তাহা হইলে আর তাহাকে চাকরি করিতে হয় না ;—নিজের জমীর ফসলে তাহাদের দিন এক-রকম বেশ কাটিয়া যাইবে। তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া দাদারও সন্ধান করিতে পারিবে। জমীজমা, বাড়ী ও দাদা—এ সকলই যদি সে উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলেই তো তাহার জীবনের সকল সাধ পূর্ণ হয় ;—আর কি চাই ?

এই হাজার-টাকা কেমন করিয়া, কতদিনে পূর্ণ

হয়, কিউস্থকির দিবারাত্র সেই ভাবনা। আয় তো বেশি নয়, কাজেই তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া তিলে-তিলে সঞ্চয় করিতে হইতেছিল। অন্য লোক হইলে হয় ত ইহা অসম্ভব বলিয়া ছাড়িয়া দিত,—বলিত, এ বিন্দু-বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র সৃষ্টি করা! কিন্তু কিউস্থকি অসীম ধৈর্য্যের সহিত এই অসাধ্য-সাধনের জন্য পণ করিয়া বসিয়াছিল। এ নইলে যে তাহার চলিবে না!

অনেক অপেক্ষার পর, শেষে সেই শুভদিন আসিল। এই মাসের মাহিনাটা পাইলেই তাহার হাজার টাকা পূর্ণ হয়। ক্রমে-ক্রমে দেখিতে-দেখিতে সে-মাসও শেষ হইয়া গেল;—কিউস্থকির আনন্দ আর ধরে না—আজ তাহার জীবনের সকল-সাধনা সকল-আশা সফল হইতে চলিয়াছে!

কিউস্থকির সঞ্চয়ের টাকা থাকিত তাহার মনিবের কাছে। ঠিক হাজার-টাকা যে-দিন পূর্ণ হইল, সেই দিন সে মনিবের নিকট বিদায় লইতে গেল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বড়ই খুসী হইলেন;—কিউস্থকির দাসত্বের দিন শেষ হইয়াছে, শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল

যে, তাঁহার নিজেরও একটা বোঝা যেন নামিয়া গেছে।

কিউস্থকি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছে না ;—এতদিন ধৈর্য্য ধরিয়া তাহার মন আর একতিল ধৈর্য্য মানিতেছে না। এখনই সে টাকা লইয়া নিজের গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। তাহার মনিব বলিলেন—"আচ্ছা বেশ, এখনই তুমি যাও, কিন্তু অত-টাকা একসঙ্গে নিয়ে যেও না। পথ তো ভালো নয়—চোর-ডাকাতের ভয় আছে। এখন কিছু সঙ্গে নাও—পরে এসে কিছু-কিছু ক'রে নিয়ে যেও।"

অপেক্ষা আর সে করিতে পারে না। এতকাল তো সে শুধু অপেক্ষাই করিয়া আসিয়াছে—এখনো অপেক্ষা ? সে আর হয় না। কিউস্থকি বলিল—"মাপ করবেন—কিচ্ছু ভয় নেই—আমি খুব সাবধানে টাকা নিয়ে যাব।" মনিব আর-একবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিউস্থকি কখনো তাঁহার কথা অমান্য করে নাই—তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা তাহার ভালোর জন্যই, তাহাও সে বুঝিতেছে, কিন্তু তবুও সে মনের

অধীরতা আজ কিছুতেই দমন করিতে পারিল না।

কিউস্থকির মনিব তাহাকে সমস্ত টাকাকড়ি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। টাকাগুলি হাতে করিয়া তুলিয়া লইবার সময় কিউস্থকির বোধ হইতে লাগিল, সেগুলি যেন তাহার চিরপরিচিত বন্ধু! সবগুলিকেই তাহার মনে আছে—দেখিবামাত্রই সে তাহাদের চিনিতে পারিতেছে!—কোন্‌টির কোন্‌খানে কোন্ দাগটি আছে, কোন্‌টি একটু ঘসা, কোন্‌টি একটু পাত্‌লা, কোন্‌টি চক্‌চকে, কোন্‌টি ম্যাড়মেড়ে, তাহা এখনো সে ভোলে নাই। এমন কি, কোন্ টাকাটি সে প্রভুকন্যার বিবাহের সময় বখসিস্ পাইয়াছে, তাহাও সে বলিয়া দিতে পারে! বহুদিন পরে বন্ধুর সহিত দেখা হইলে যেমন আনন্দ হয়, টাকাগুলিকে দেখিয়া কিউস্থকির তেমনি আনন্দ হইতে লাগিল!

এই টাকাগুলি খুব সাবধানে বাঁধিয়া লইয়া কিউস্থকি সেই রাত্রেই যাত্রা করিল—পরদিন প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা সহিল না। যাইবার সময় তাহার মনিব

বলিলেন—"অস্ত্র-একখানা সঙ্গে নাও—কি জানি, যদি কোনো বিপদ্ ঘটে!" বলিয়া ভালো দেখিয়া একখানা তরোয়াল তিনি তাহার কোমরে বাঁধিয়া দিলেন।

কিউস্থকি বাড়ী হইতে বাহির হইল। গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে-যাইতে তাহার পরিচিত পথঘাট, বাড়ীঘর প্রভৃতির নিকট হইতে তাহার মন একে-একে বিদায় মাগিয়া লইতে লাগিল,—সে যেন সবাইকেই মনে-মনে বলিতেছিল—'ভাই, চল্লুম!'

আজ তাহার প্রাণ কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে;—কেবল একটা বেদনা থাকিয়া-থাকিয়া মনের মধ্যে বিঁধিতেছিল—মাকে গিয়া সে কি বলিবে! মা তো টাকার প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া নাই—সে বলিয়া আসিয়াছে, দাদাকে ফিরাইয়া আনিবে—মা যে সেই-পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। সে ভাবিল, এতদিন মা অপেক্ষা করিয়াছেন, আরো দুটো দিন না-হয় করুন—আমি দেশে ফিরিয়া সকল ব্যবস্থা করিব।

গ্রাম ছাড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহার পথ—সেই পথে সে চলিতে

লাগিল। দেখিতে-দেখিতে রাত্রি অনেক হইয়া আসিল—বনের মধ্যে অন্ধকার ক্রমেই জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল ;—কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্নমাত্র নাই—গাছগুলার গা হইতে পর্য্যন্ত যেন অন্ধকার ঝরিয়া পড়িতেছে ;—কোলের মানুষ দেখা যায় না! কিন্তু কিউ-সুকির মন এতই উতলা যে, কোনো বাধাই তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারিল না ;—সে সেই অন্ধকার ঠেলিয়া চলিতে লাগিল।

এই ঘন-অন্ধকারের মধ্যে চলিতে-চলিতে কখন্ যে পথ হারাইয়া ফেলিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। শেষে যখন বুকের কাছে গাছের ডালপালা আসিয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চমক ভাঙিল। পথ পাইবার জন্য সে চতুর্দ্দিক্ হাতড়াইতে লাগিল, কিন্তু পথ কিছুতেই মিলিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমেই সে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল। অন্ধ-কারের মধ্যে এদিক্-ওদিক্ করিতে গিয়া ক্রমে তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল—কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, কোন্ দিকে যাইতে হইবে, তাহার কিছুই ঠিক রাখিতে

পারিল না। একবার একটু রাস্তার মতো পায়, আবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়ে! এমনি করিয়া ঘুরিতেছে, হঠাৎ একটা খস্-খস্ শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল; মনে হইল অন্ধকারের গা হইতে মূর্ত্তি ধরিয়া কে যেন তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কাছে আসিতে কিউসুকি দেখিল, এক বন্য-শীকারী!

তাহাকে দেখিয়া কিউসুকি যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—"ওহে, আমায় পথ ব'লে দিতে পার?"

শীকারী তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তার পর গম্ভীর স্বরে বলিল—"যাবে কোথা?"

কিউসুকি নিজের গ্রামের নাম উল্লেখ করিল।

শীকারী তাহাকে খানিকদূর সঙ্গে লইয়া একটা পথের মাথায় আসিয়া বলিল—"এই সাম্‌নের রাস্তা ধ'রে বরাবর উত্তর-মুখে চ'লে যাও।"

কিউসুকি সেই-পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল—ক্রমেই শ্রান্তিতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল—পা

আর চলে না। এমন সময় দেখিল, কিছু দূরে একখানি কুটীর। কুটীরের মধ্য হইতে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা বাহিরের ঘন অন্ধকারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কিউস্থকি ধীরে-ধীরে সেই কুটীর অভিমুখে চলিল। কুটীরের মধ্যে এক রমণী বসিয়া আপন-মনে কাপড় সেলাই করিতেছিল। এত রাত্রি, তবু ঘুমাইতে যাইবার কোনো তাগিদ আছে বলিয়া বোধ হইল না। সে এমনি নিবিষ্ট-মনে কাজ করিতেছিল। কিউস্থকি তাহার কাছে গিয়া বলিল—"আমি ক্লান্ত পথিক, আজ রাত্রের মতো এখানে একটু স্থান পাবো?"

রমণী বিস্ময়ের সহিত কিউস্থকির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল,—তার পর অধিকতর বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"এত রাত্রে এ-পথে তুমি কেমন ক'রে এলে?"

কিউস্থকি বলিল—"আমি বনের মধ্যে পথ হারিয়েছিলুম—এক শীকারী আমায় এই পথ দেখিয়ে দিয়েছে।" বলিয়া সে বসিয়া পড়িল—আর সে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না।

রমণী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, কেমন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, শেষে এদিক্-ওদিক্ চারিদিক্ চাহিয়া অবরুদ্ধ-স্বরে বলিয়া ফেলিল—"জান, এ কোথায় এসেছ ?"

কিউসুকি অবাক্ হইয়া রমণীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর বলিল—"না ! এ কোথা ?"

রমণী বলিল—"এ ডাকাতের বাড়ী। যে-শীকারী তোমায় পথ ব'লে দিয়েছে, সে ডাকাত—তারই এই বাড়ী।"

কিউসুকি উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল—"এখন উপায় ?"

রমণী বলিল—"উপায় তো কিছু দেখি না—নিশ্চয় সে তোমার পিছনে আস্‌ছে—এখনই এসে পড়্‌বে।"

কথা শেষ না হইতেই বাহিরে কাহার পদ-শব্দ শোনা গেল। রমণী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কিউসুকিকে বলিল —"ওঠ, ওঠ—আর দেরী কোরো না !" বলিয়া তাহাকে সে ঠেলিতে-ঠেলিতে এক ঘোর অন্ধকার কোণের মধ্যে বসাইয়া দিল।

শীকারী কুটীরে প্রবেশ করিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"শীকার কোথায় ?"

রমণী কোনো উত্তর করিল না—বিস্ময়ের ভান করিয়া তাহার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। শীকারী আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"শীকার কই ?"

রমণী যেন কিছুই জানে না, এমনি ভাবে বলিল—"শীকার !"

—"হাঁ, হাঁ, শীকার।"

রমণী বিস্ময়ের সহিত বলিল—"কই ?"

শীকারী অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়া বলিল—"আমি বরাবর তাকে এই পথে আস্‌তে দেখেচি ;—পথেও নেই. ঘরেও নেই, সে কি তবে উবে গেল ?"

রমণী শুধু বলিল—"কি জানি !"

শীকারী তখন রাগে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"বুঝেচি, এ তোরই কাজ। এ রোগ তোর সারল না ! বল্, কোথায় লুকিয়েচিস !" বলিয়া সে সজোরে এক পদাঘাত করিল। রমণী মাটীতে লুটাইয়া পড়িল—তবু কোনো কথা কহিল না।

রমণীকে নিরুত্তর দেখিয়া শীকারীর রাগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল—ক্রমাগত প্রহার করিতে-করিতে তাহাকে প্রায় আধমরা করিয়া ফেলিল। রমণী তবুও কোনো কথা বলিল না—পড়িয়া-পড়িয়া কেবল মার খাইতে লাগিল।

কিউসুকি অধীর হইয়া উঠিল—আর নিজেকে গোপন রাখা চলেনা—তাহার জন্য এই অবলা নারীকে কি লাঞ্ছনাই না ভোগ করিতে হইতেছে! সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"এই আমি!"

শীকারী তখন রমণীকে ছাড়িয়া বাঘের মতো কিউ-সুকির ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল। কিউসুকি তখনও এমন শ্রান্ত যে, ভালো করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না,—কাজেই সে কোনোরূপ বাধা দিতে পারিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দস্যু তাহার সমস্ত অর্থ অতি সহজে কাড়িয়া লইয়া এক টুক্‌রা ছিন্ন বস্ত্র পরাইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল; কিউসুকি কোনো বাধা দিল না বলিয়া তাহাকে প্রাণে মারিবার আবশ্যক বোধ করিল না।

কিউস্থকি নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় পথে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার তরোয়ালখানি পর্য্যন্ত দস্যুতে কাড়িয়া লইয়াছে। বন্য পশুর ভয় আছে!—কিউস্থকি কাতর-কণ্ঠে দস্যুকে ডাকিয়া কহিল—"আমার সব নিয়েছ নাও, কেবল তরোয়ালখানি ফিরিয়ে দাও, নইলে বাঘে ভাল্লুকে প্রাণটা নেবে!"

কি-জানি-কেন, দস্যুর দয়া হইল। তরোয়ালখানা হাতে করিয়া তুলিয়া কিউস্থকিকে দিতে গেল—অন্ধকারে সেটা একবার ঝকঝক করিয়া উঠিল। অমনি দস্যু বলিয়া উঠিল—"এখানা একেবারে নতুন দেখ্‌চি যে! রোসো! এখানা থাক, আর-একখানা দিচ্ছি!" এই বলিয়া সে ঘরের মধ্য হইতে একখানা পুরাতন তরোয়াল আনিয়া কিউস্থকির হাতে দিল।

পরদিন সকালে কিউস্থকি ছিন্নবেশে, শুষ্ক-মুখে প্রভুর দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লজ্জায় সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। টাকা-গুলা গিয়াছে বলিয়া তাহার মনে দুঃখ হইতেছিল বটে, কিন্তু প্রভুর কথা না শুনিয়াই যে তাহার এমন অবস্থা

হইয়াছে, সেইটাই তাহার বুকে বেশি করিয়া বাজিতে-ছিল—তাহার মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতেছিল।

কিউস্থকির মনিব সকালে বাড়ীর বাহির হইতে গিয়া যখন দেখিলেন, ছিন্ন-বস্ত্রে মলিন-মুখে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া কিউস্থকি, তখন তিনি বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন চোখের সাম্‌নে কোন্ যাদুকরের যাদু দেখিতেছেন। যে কিউ-স্থকি কা'ল রাত্রে হাসি-মুখে বিদায় লইয়া গেছে, এ কি সেই! কিউস্থকির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইতে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। কিউস্থকি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। তিনি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—একটুও তিরস্কার করিলেন না। কিউস্থকি যেন গতরাত্রে ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ সকালে আবার নিয়-মিত কাজ স্থরু করিল,—মধ্য হইতে রাত্রের ব্যাপারটা যেন দুঃস্বপ্নের মতো ঘটিয়া গেছে।

দস্যু যে পুরানো তরোয়ালখানা দিয়াছিল, তাহা কিউস্থকির ঘরের দেয়ালে টাঙানো থাকিত। সেখানা

দেখিলেই তাহার সেই সর্ব্বনেশে রাত্রের কথা মনে পড়িয়া যাইত। সমস্ত দিন কাজকর্ম্মের পর সে যখন শয়ন করিতে আসিত, তখন সেই টাকাগুলার শোক প্রতিরাত্রে নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিত—নিরুৎসাহে তাহার মন ভাঙিয়া পড়িত।—আর কি সে বন্ধকী জমীজমা উদ্ধার করিতে পারিবে? —না, দাদাকে খুঁজিয়া আনিয়া মায়ের শোকাশ্রু মুছাইতে পারিবে? তাহার আশা-ভরসা সব গিয়াছে! টাকাগুলা যে জন্মের মতো গিয়াছে, সে কথা সে ভুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত; কিন্তু প্রতিরাত্রে সেই তরোয়াল খানা দেখিলেই তাহার টাকার শোক উথলিয়া উঠিত; সেই সমস্ত স্মৃতি একে-একে মনে পড়িত;—সমস্ত ব্যাপারটা যেন সে চোখের সামনে দেখিতে পাইত। তখন সেই দস্যু-গৃহের রমণীর কথা মনে পড়িয়া, তাহার প্রতি একটা আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় তাহার মন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত; তাহার জন্যই না সে প্রাণে বাঁচিয়াছে! তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সে রমণীকে কি লাঞ্ছনাই না সহ্য করিতে হইয়াছে! তাহার সে ঋণ এ-জীবনে কি সে শোধ দিতে পারিবে?

শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, তরোয়ালখানা চোখের সাম্‌নে রাখা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। সেটাকে লইয়া সে যে কি করিবে, প্রথমে ভাবিয়া পাইল না; —পরে ঠিক করিল, পুরানো জিনিসের দোকানে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিবে। গ্রাম হইতে একটু দূরে এক-খানা পুরানো জিনিসের দোকান ছিল; একদিন সে তরো-য়ালখানা লইয়া সেইখানে গেল। দোকানী বৃদ্ধ,—চোখের জ্যোতি তাহার কমিয়া আসিয়াছে;—সে তরোয়ালখানা তুলিয়া চোখের খুব কাছে লইয়া গিয়া তাহার উপর ধীরে-ধীরে চোখ বুলাইতে লাগিল; তার পর তরোয়াল-খানার মাঝামাঝি আসিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিল— "এ যে বহুমূল্য জিনিস দেখ্‌চি!"

কিউস্থকি চুপ করিয়া রহিল। দোকানী আবার বলিল—"এতে বাদশার ছাপ আছে—এর দাম অনেক!"

কিউস্থকি জিজ্ঞাসা করিল—"কত?"

—"দেড় হাজার!"

দেড়হাজার! কিউস্থকি চমকিয়া উঠিল। তাহা হইলে তো তাহার সকল দুঃখের অবসান!

দেড়হাজার টাকা পাইয়া কিউহ্নকির মনে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। সে যে মনে মনে বলিত, দিন আসিলে দস্যু-গৃহের সেই রমণীর ঋণ সে শোধ করিবে—এখন ত সেই সুদিন আসিয়াছে! হাজার টাকা তাহার প্রয়োজন; অতিরিক্ত পাঁচশত টাকা দিয়া সে তো অনায়াসে ঋণ শোধ করিতে পারে। এই পাঁচশ টাকা পাইলে সেই মেয়েটি হয় ত দস্যুর নিকট হইতে চিরদিনের মতো মুক্তি পাইতে পারিবে—নিশ্চয়ই সে তাহার ক্রীতদাসী! এ কথা সে যতই ভাবিতে লাগিল, টাকা দান করিবার ইচ্ছা তাহার ততই প্রবল হইতে লাগিল;—তাহার মনে হইতে লাগিল,—এ না করিলে তাহার পাপের সীমা-পরিসীমা থাকিবে না।

মনিবের নিকট এক হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সে আবার বাহির হইল। সঙ্গে পাঁচশ টাকা। ইচ্ছা, ঐ টাকাগুলা রমণীকে দিয়া সে বাড়ীর দিকে যাইবে—পথে যে-কখানা গ্রাম পড়ে, সেগুলা একবার অনুসন্ধান করিয়া যাইবে। হয় ত ঐ গ্রাম কখানারই কোনোটার মধ্যে তাহার দাদা আত্মপরিচয় গোপন করিয়া বাস করি-

যেছে—লজ্জায় নিজের গ্রামে ফিরিতে পারিতেছে না। কিউস্থকির বোধ হইতেছিল, তাহার জীবনে এইবার দুর্দ্দিনের মেঘ কাটিয়া সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইতেছে! কেবল একটা সংশয় দাদাকে লইয়া!—তাহাকে যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মায়ের কাছে সে কি বলিয়া দাঁড়াইবে!

এবার সে এমন-সময় বাড়ী হইতে বাহির হইল, যাহাতে দিনের আলো থাকিতেই বনটা পার হইতে পারে। কিন্তু সে যখন দস্যুগৃহে পৌঁছিল, তখন বনের মাথা পার হইয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন,—গাছের ফাঁক দিয়া চারিদিকে সোনালি আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে;—লাল আকাশের প্রান্ত হইতে পাখীরা কুলায়ে ফিরিয়া আসিতেছে—সমস্ত বন একটি স্নিগ্ধ আলো ও মৃদু গুঞ্জনে ভরিয়া উঠিয়াছে!

কিউস্থকি কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সে কাহাকেও ডাকিল না;—রমণীকে সে গোপনে টাকা দিতে চাহে,—দস্যু জানিলে নিশ্চয় কাড়িয়া লইবে। কিউস্থকি অপেক্ষা করিতে লাগিল। দিনের আলো ধীরে-ধীরে মিলাইয়া যাইতে-

ছিল—ছায়ার মতো একটা অন্ধকার কুটীরখানিকে গ্রাস করিতে লাগিল ; পাখীর কলরবও থামিয়া গেল। শেষে চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইয়া আকাস-বাতাস ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। কিউমুকি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। হঠাৎ দেখিল, ঘরের মধ্যে একটি ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর অপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া সে অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, জীর্ণ মলিন শয্যায় সেই দস্যু স্থির হইয়া পড়িয়া আছে,—শিয়রে প্রদীপ জ্বালিয়া রমণী বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া রমণী চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল ; কিউমুকি তাড়াতাড়ি টাকার তোড়া তাহার হাতের কাছে ধরিয়া বলিল—"এই নাও! সে রাত্রে আমার জন্যে তুমি যা করেচ, সে ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।"

টাকা দেখিয়া রমণীর মুখ হইতে কালো মেঘের মতো একটা বিষাদের ঘন ছায়া যেন সরিয়া গেল ;—সে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"আজ তুমি আমাদের প্রাণ দিলে! আমরা অনাহারে মারা যাচ্ছিলুম।"

টাকার কথা শুনিয়া দস্যুও তাহার ক্ষীণদেহ

তুলিয়া বসিল। কিউস্থকি চলিয়া যাইতেছিল। দস্যু তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিল। কিউস্থকি ধীরে-ধীরে তাহার শয্যাপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে,—রুগ্নদেহে অনাহারে সে পলে-পলে মরিতেছিল,—এমন কি, একটু আগে সে যেন মৃত্যুর ছায়া সম্মুখে দেখিতেছিল,—এ বিজন বনের মধ্যে কোথাও এতটকু আশার আলো ছিল না। তার পর হঠাৎ এ কী! একদিন সে যাহার জীবন লইতে গিয়াছিল, আজ সেই তাহাকে জীবন দিতে আসিয়াছে! সে কিউস্থকির হাত-দুখানা টানিয়া লইয়া নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল—তাহার চোখের কোণেও জল দেখা দিল। কিউস্থকির মুখ দেখিয়া তাহার কেমন ইচ্ছা হইতেছিল, কিউস্থকিকে বুকের মধ্যে একবার চাপিয়া ধরিয়া হৃদয় শীতল করিয়া লয়! কিন্তু সে পারিল না—অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

কিউস্থকি অবাক্ হইয়া দস্যুর এই হৃদয়োচ্ছ্বাস দেখিতেছিল—তাহারও সমস্ত হৃদয়টা কেমন আর্দ্র হইয়া

উঠিতেছিল। সে ধীরে-ধীরে দস্যুর শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। দস্যু আবার তাহার হাতখানা তুলিয়া লইল—অনেক কথা তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার একটাও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

সে চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, যাহাদের জন্ত সে বিপদকে বিপদ জ্ঞান করে নাই,—যাহাদের প্রাণ-রক্ষার জন্ত সে নিজের প্রাণকে মৃত্যুর সম্মুখে রাখিয়া যুঝিয়াছে—তাহার সেই সব অনুচরেরা তাহার এই অসুস্থতার দিনে, তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া চলিয়া গেল; আর যাহাকে সে প্রাণে মারিতে গিয়াছিল সেই আজ কি না তাহার জীবন দান করিতে আসিয়াছে! ভাবিতে-ভাবিতে তাহার হৃদয়টা হায় হায় করিতে লাগিল—সে রুদ্ধশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"পাষণ্ড আমি!"

দস্যু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—যেন সে ভিতর হইতে একটু বল সংগ্রহ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। তারপর কিউসুকির মুখের দিকে

চাহিয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল—"আমার মতো হতভাগা জগতে নেই—আমি নরাধম!" বলিয়া সে করুণ স্বরে আত্মকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। কিউসুকি স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে রাত্রির অন্ধকার ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছিল; বাহিরের বাতাস, গাছের পাতায়-পাতায় আছাড় খাইয়া হা-হা করিয়া উঠিতেছিল; দস্যু দীর্ঘশ্বাসের মতো অবরুদ্ধ স্বরে নিজের কাহিনী বলিয়া যাইতেছিল। কিউসুকি একমনে শুনিতেছিল,—তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। দস্যু তাহার ছোট্টো ভাই ও মায়ের কথা বলিতে গিয়া যখন কাঁদিয়া ফেলিল, তখন কিউসুকি হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, তারপর দস্যুকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"দাদা! দাদা!"

দস্যু বিস্মিত হইয়া একবার কিউসুকির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, তারপর দুই বাহু আকুলভাবে তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল!—রমণী ঘরের ক্ষীণ দীপশিখা উস্কাইয়া উজ্জ্বল করিয়া দিল!

তালপাতার সেপাই

আমার বাড়ীতে সেদিন ছোটোখাটো একটা সান্ধ্য-সম্মিলন ছিল। অতিথিদের মধ্যে আমার বিশেষ বন্ধু শ্রীমতী ভবেয়ার ও তাঁর জাঠতুতো ভাই রেনি—এঁরা দুই জনেই উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ ঘরের এককোণ হইতে শুনিলাম, রেনি বলিতেছে—"আমার বিশ্বাস, এ দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে বুক-ফুলিয়ে বলতে পারে যে জীবনে কখনো কারুর প্রতি অন্যায় বা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিনি।"

আমি শ্রীমতী ভবেয়ারের কাছেই বসিয়াছিলাম। দেখিলাম ঐ কথার ধাক্কায় একটা চমকানি তাঁর সমস্ত দেহের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল, কেমন-একটা বিবর্ণতা তাঁর সেই সুন্দর দেহশ্রীর উপর ছড়াইয়া পড়িল এবং সেই উজ্জল চোখদুটির উপর একটা দুঃখের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। মনে হইল, যেন একটা মর্ম্মান্তিক

করুণ স্মৃতি মুছিয়া লইবার জন্যই তাঁর হাতখানি কপালের উপর বুলাইয়া লইলেন,—এবং যে-কয়েকটি অকালপক্ক চূর্ণ-কুন্তল মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা তুলিয়া দিলেন। তারপর, হঠাৎ যেন একটা অনু-শোচনার উত্তেজনায় বলিয়া উঠিলেন—"সত্যি! কথাটা খুবই সত্যি! হয় ত বিশ্বাস করবেন না—আমাকে এখন যেমন ভালোমানুষ দেখচেন, এমন আমি চিরদিন ছিলুম না। একটা কঠোর অভিজ্ঞতায় আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে আগাগোড়া তলিয়ে না দেখে কারো সম্বন্ধে কোনো-একটা ধারণা করে নেওয়া ভয়ানক অন্যায়। উঃ, আমি কি নিষ্ঠুরতাই করেচি।"

বলিয়া তিনি করুণ কণ্ঠে এই গল্পটি আরম্ভ করিলেন—"আমরা সমুদ্রতীরে হাওয়া-বদলাতে গিয়ে-ছিলুম—ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান্ যুদ্ধ তখন পাঁচ বছর হল শেষ হয়েছে। আমি, মা ও রেনি—আমরা এই তিন জনে এক হোটেলে ছিলুম। তখন আমার বয়েস অল্প—রূপের গর্ব্ব প্রচণ্ড। আমি আশা করতুম—আশা কি, দাবীই করতুম--আমার আশ-পাশের সকলে দিবারাত্র

আমার রূপের বন্দনা করুক—আমার পায়ে তাদের মুগ্ধ হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি ঢেলে দিক।

হোটেলের মধ্যে বড়-কাউকে আমি গ্রাহ্যে আনতুম না; কিন্তু কেন জানিনা, একটি লোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বয়স তার ত্রিশের কাছাকাছি,—সুশ্রী, সুগঠিত, বলিষ্ঠ দেহ। মুখে-চোখে একটা উদ্দাম উৎসাহ, একটা তেজ,—কিন্তু কেমন-একটি দারুণ দুঃখে যেন সর্ব্বদাই অভিভূত। সৈনিকপুরুষের মতো তার পোষাক। তার এক চাকর ছিল, সেই প্রতিদিন তার খাবার বহে নিয়ে যেত;—খাবার-ঘরে সে কখনো আসত না। একলা আপন-মনে নির্জ্জনে সে ঘুরে বেড়াতো—কারুর সঙ্গে সে আলাপ করত না, তার দিকেও কেউ ঘেঁসত না। দেখতুম, সেনাধ্যক্ষেরা যেমন লম্বা কালো কোট পরে—তেমনি একটা জামা দিনরাত গায়ে ঝুলচে।

আমার ভারি অদ্ভুত লাগতো—একটা কৌতূহল ক্রমেই আমার মনে জমে উঠতে লাগলো। আমি একদিন ফন্দি করে তার সামনে গিয়ে পড়লুম; যা-হোক-একটা অছিলা করে কথা পাড়লুম। উত্তর পেলুম

বটে কিন্তু তা তাচ্ছিল্যতায় পরিপূর্ণ ;—শুধু "হাঁ" ! আর "না!" কিন্তু ঐটুকুর মধ্যেই দেখলুম তার সেই গম্ভীর বিষাদমাখা মুখখানি এক-একবার স্ফূর্তির স্ফুলিঙ্গে যেন জ্বলে-জ্বলে উঠতে লাগল।

আমি অন্যমনস্কতার অভিনয় করে হাতের দস্তানাটা মাটিতে ফেলে দিলুম। কী ছেলেমানুষি আমার ? তার মুখে একটা ব্যস্ততা, একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল, কিন্তু ভদ্রতা করে আমার দস্তানাটি তুলে না দিয়েই সে তাড়া-তাড়ি চলে গেল।

সেই দিন থেকে আমার সঙ্গে আলাপ করা দূরে থাকুক—আমাকে দেখলেই সে যেন ভয়ে পালিয়ে যেত ; আমাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলত। রেনি এই নিয়ে খুব একচোট হাসিঠাট্টা করে নিলে। তার চেহারা ও ধরণ-ধারণের উপর টিট্‌কারি হেনে সে তার নাম দিলে—"তালপাতার সেপাই"। তার এই ঠাট্টায় আমি খুব কসে রসান দিলুম ; কারণ আমার প্রতি সেপাইয়ের সেই রূঢ় অনাদর আমার যৌবনের রূপের অভিমানকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।

দুটি ঘটনায় আমার এই আহত অভিমান শেষে দারুণ ঘৃণায় পরিণত হয়ে পড়ল। একদিন সকালে আমি সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে ফিরচি; পথে জনমানব নেই; কেবল এক রোগশীর্ণ বুড়ী মোট-মাথায় ধীরে-ধীরে আসছিল। এমন সময় দেখি "সেপাই" একটা ঝোপে-ঢাকা বাঁকের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। জানিনা কি কারণে—সেপাইকে আচম্‌কা দেখেই হোক, কিম্বা মোটের ভারেই হোক, বুড়ীটা মোট-সুদ্ধ ধপ্‌ করে পড়ে গেল। বেচারা মাটিতে পড়ে কাতর-ভাবে এ-দিক ও-দিক চাইতে লাগল। আমি তাকে তুল্‌তে ছুটে গেলুম এবং তার মোটটাও উঠিয়ে দিলুম কিন্তু "সেপাই" একেবারে অচল,—সে এতটুকু সাহায্যও করলে না।

আমি রাগ দেখিয়ে তার দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইলুম; বল্লুম—"এমন অভদ্র তো কোথাও দেখিনি—মানুষের চামড়া যার গায়ে আছে সে যে এমন নীচ ব্যবহার করতে পারে, জানতুম না। আমার কাছে পয়সা নেই, কী আপশোষ! মশায় কি দয়া করে এই বুড়ীকে কিছু দান করবেন ?"

সে কেমন ইতস্তত করতে লাগল; একটা তীব্র বেদনার ছায়া তার চোখের উপর ঘনীভূত হয়ে এল। মনে হল, সে যেন কি বলতে চাচ্চে—বোধ হয় তার এই অভদ্র ব্যবহারের অর্থ কি তাই, কিম্বা হয়তো ক্ষমা-প্রার্থনা। কিন্তু দেখলুম বলবার ঐ চেষ্টাটুকুই তার পক্ষে যেন মর্ম্মান্তিক হয়ে উঠচে। তার ঠোঁট একবার কাঁপলো, কিন্তু কোনো বোধগম্য কথা বার হল না;—তার মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল, তার সেই একঘেয়ে অবিচ্ছিন্ন নীরবতা আবার ফিরে এল! সে আমার দিকে আর না-চেয়ে, আমার কথা উপেক্ষা করে চলে গেল।

জীবনে এই প্রথম, আমি-হেন-যে-সুন্দরী তারও অনুরোধ অবহেলায় ভেসে গেল—সে যে আমার কী অসহ্য হল, তা বলতে পারি না! রাগে, ক্ষোভে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলতে লাগ্‌ল। হোটেলে ফিরে এসে রেনিকে সব বল্লুম। সেও চটে আগুন। সে বল্লে—"একবার দেখা হোক না সেপাইয়ের সঙ্গে, ভালো করে বোঝা-পড়া করে নেব।" তার এই রাগের আগুনে, আমার সেই তখনকার ছেলে-মানুষীর উৎসাহে, খুব কসে ইন্ধন দিতে লাগলুম।

সপ্তাহখানেক আর তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। আমি বল্লুম—"তাল-পাতার সেপাই ভয় খেয়েছে, তাই পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছে।" রেনিও এই কথায় সরোষে সায় দিলে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জেটির উপর বেড়াতে গেছি—তখন ঝড় উঠেছে—পায়ের তলায় সমুদ্র কেবলই দুলে-দুলে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠেছে। হঠাৎ নীচে থেকে একটা আর্তনাদ উঠল। আমরা কিনারার দিকে ছুটে গেলুম। দেখি সেপাই সেখানে দাঁড়িয়ে। তার সমস্ত মুখখানা একটা দারুণ ভয় ও উৎকণ্ঠায় কম্পিত হয়ে উঠেছে। সে আমাদের দেখে ভয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল—"দেখ, দেখ, একটা লোক জলে ডুবলো; দেখ!"

আমি অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম। আমার ভাব বুঝে রেনি আর থাক্‌তে পারলে না। সে ছুটে গিয়ে বল্লে—"মশাই কি মজা দেখছেন? একটা লোক ডুবছে, মেয়েমানুষের মতো চীৎকার করা ছাড়া কি আর কিছু করবার নেই?"

এই বলে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে গেল। দুই-

জন নাবিক ছুটে এসে তার হাত ধর্‌লে, তৃতীয় নাবিক জলে নেমে গেল।

"ঐযে! ঐযে জলে ভাসছে;—ঐ উঠিয়েছে!" বলে সেপাই কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটাকে উদ্ধার করে নাবিকেরা নিয়ে এল,—আমাদের সাম্‌নে দিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে চলে গেল। আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। সেপাইয়ের মুখ থেকেও উৎকণ্ঠার ভার নেমে গেল।

লোকের ভিড় ক্রমে-ক্রমে ভেঙে গেল;—শেষে কেবল আমরা দুজনে ও সেপাই সেইখানে রইলুম। তার দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ একবার মনে হল, তার সেই উন্নত সুদৃঢ় চেহারার সঙ্গে, সেই মুখের উপরকার তেজস্বিতার সঙ্গে তার এই ভীরু ব্যবহার মোটেই খাপ খায় না। আমি ক্ষণেকের জন্য একটু আশ্চর্য্য হলুম বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার প্রতি আমার সেই মনের জ্বালা আবার ফিরে এল; আমি ইসারায় রেনিকে উত্তেজিত করে তুল্‌লুম; সে ছুটে গিয়ে সেপাইয়ের মুখের সাম্‌নে দাঁড়াল এবং দাঁতে-দাঁত দিয়ে বলে উঠল—"কাপুরুষ কোথাকার!"

তার চোখের একটি কোমল, কাতর দৃষ্টি আমার মুখের উপর এসে পড়ল!—হঠাৎ মনে হল, আমার প্রতি একটি প্রীতি যেন তার হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত আছে, কিন্তু আমার উগ্রতা সে সহ্য করতে পারচে না। রেনির মুখের ঐ অবজ্ঞার অপমানে তার চোখের পাতাগুলি কাঁপতে-কাঁপতে একেবারে নুয়ে পড়ল—এবং একটা নিদারুণ অসহায়তা তার সমস্ত মুখখানিকে ম্রিয়মাণ করে ফেল্লে। তার ঠোঁট দুখানি একেবারে নীল হয়ে গেল। সে একটি কথাও কইলে না।

তার এই নিস্তেজ নীরবতায়—এই কাপুরুষতায় আমার মেজাজ আবার অসহ্যতায় রুখে উঠলো! কিন্তু রাগ, ঘৃণা, কৌতূহল এবং তার পক্ষে অশোভন এই কাপুরুষতার প্রতি কেমন-একটু অবিশ্বাসের মধ্যে পড়ে আমি যেন ঘুরপাক খেতে লাগলুম। সেটা কাটিয়ে নিয়ে আমার শেষ-আঘাত আমি তাকে ছুঁড়ে মারলুম। বল্লুম—"রেনি, তুমি যদি ওকে এক-ঘা চড় কসিয়ে দাও তাহলেও ওর এমন সাহস হবে না যে সেই অপমানের তাড়নায় তোমার উপর হাতটুকু পর্য্যন্ত তুলবে! এমন পৌরুষ ওর নেই!"

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই আমি বুঝতে পারলুম, আমার ঐ আঘাত কী সাজ্ঘাতিক, কী ভয়ঙ্কর! তার বিবর্ণ-মুখের প্রত্যেক শিরাটি পর্য্যন্ত কুঞ্চিত হয়ে গেল;—মনে হল একটা ভয়ঙ্কর মানসিক বিপ্লব তার টুঁটি চেপে ধরেছে। রুদ্ধ কণ্ঠে—তার এই কণ্ঠস্বর আমি ইহজীবনে কখনো ভুলতে পারবো না—হতাশায় রুদ্ধ, কাতরতায় ভগ্ন সেই কণ্ঠস্বরে—সে আমার দিকে চেয়ে—গুমরে বলে উঠল—"আমি কাপুরুষ নই! কিন্তু দেবী, তুমি বড় নিষ্ঠুর! তোমার এই কঠিন নিষ্ঠুরতায় আমার হৃদয়ের একটি গোপন-ব্যথাকে আজ খুলে ধরতে হল। সে কোনো সত্যিকার ঘৃণা বা লজ্জার কথা নয়; কিন্তু আমার দেহের শক্তি নিয়ে গিয়ে আমার চিরদিনের গর্ব্ব—তাই সে আমার লজ্জার কথা! তাই আমি সেই লজ্জা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখি! আমার দুঃখের কথা বলে আমি যে লোকের কৃপাপাত্র হব—বিশেষতঃ—তোমার—সে আমার পক্ষে নিদারুণ! তাই আমার এই গোপন কথাটি আমি মর্ম্মের মাঝখানে বহন করচি! কিন্তু কী নিষ্ঠুর তুমি! আমার সেই প্রাণের বেদনা গোপন রাখতে দিলে

না;—আমার মর্ম্মস্থল ছিন্ন করে তাকে বার করে আন্‌লে তবে ছাড়লে!”—বলে সে বল্‌তে লাগলো—”তবে শোনো আমার গোপন কথা:—ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়ান্ যুদ্ধে আমি গোলন্দাজ ছিলুম! একটা পুল তোপ দিয়ে উড়িয়ে দেবার সময় শত্রুদের এক গোলায় আমার দুটো হাতই উড়ে যায়। আমি কাপুরুষ নই!—হায়, হাত তুলে সেকথা তোমার সাম্‌নে প্রমাণ করবার উপায়ও ভগবান রাখেন নি!”

অনুশোচনার একটা তীব্র শিহরণ আমার সমস্ত দেহের উপর দিয়ে বহে গেল। আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। সাম্‌লে উঠে তার কাছ থেকে ক্ষমা চাইবার আগেই দেখি সে চলে গেছে।

শ্রীমতী ভবেয়ার এই করুণ কাহিনী শেষ করিয়া একেবারে মুসড়িয়া পড়িলেন; তাঁহার চোখ দেখিয়া মনে হইল, সেই অতীত ঘটনার স্মৃতির ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে তিনি তখনো যেন ঘুরপাক খাইতেছেন।

আমি বলিয়া উঠিলাম—”বাস্তবিকই—অনুতাপের কথা। তার সঙ্গে কি আপনার আর দেখা হয় নি?”

—”না!” বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

জবাব

তার নাম কোয়াঞ্জি। সে ছিল নট;—নৃত্য করা তার ব্যবসা। রাজারাজড়ার সভা ছাড়া সে কোথাও নাচত না; তার নাচ দেখবার জন্যে লোকে যেন পাগল হয়ে থাকত, এমনি চমৎকার তার নাচ!

পুরাণের গল্প নিয়ে সে তার নৃত্য রচনা করত। সেই জন্ত দেবদেবীর মতো তাকে সাজসজ্জা পরতে হত—তাঁদের মুখের মতো মুখস পরতে হত।

সেই সময় আর-একজন লোক ছিল; তার নাম জেঙ্গোরা। মুখস তৈরি করা তার ব্যবসা। তার মতন এমন চমৎকার মুখস দেশের মধ্যে কেউ তৈরি করতে পারত না!

কোয়াঞ্জির যখন যে-মুখসের দরকার হত এই কারি-গরের কাছ থেকে তৈরি করিয়ে নিত। জেঙ্গোরার

হাতের মুখস পরে সে যখন নৃত্য-সভায় এসে দাঁড়াত—তখন লোকে অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে থাক্‌ত। ঠিক মনে হত যেন সেই পুরাণের গল্প থেকে মরা-লোক উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। জেঙ্গোরার মুখসের বাহাদুরিতে তার নাচ আরো জমে উঠ্‌ত।

জেঙ্গোরা কারিগর ভালো ছিল বটে কিন্তু তার একটা দোষ ছিল—সে ভয়ঙ্কর মাতাল! মদ পেলে সে আর কিছু চাইত না—হাতের কাজ তার মাটিতে গড়াগড়ি যেত।

কেউ কিছু কাজ দিতে এলে সে প্রায়ই হাঁকিয়ে দিত—কিন্তু কোয়াঙ্গির উপর তার একটু মনের টান ছিল। কোয়াঙ্গির নাচ সে দেখেচে। সে মনে মনে বল্‌ত—"হাঁ কোয়াঙ্গি একটা লোকের মত লোক;—কারিগর বটে!" সেই জন্য কোয়াঙ্গি কোনো একটা মুখস তৈরি করতে দিলে সে কোনো-রকমে মদের নেশা ঠেলে ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসত;—কোয়াঙ্গির জন্য মুখস তৈরি করতে-করতে মদের নেশার মতোই একটা মৌতাত তার ধরে যেত।

কিন্তু একবার একটা উৎসবের সময় ভারি গোল বাধ্‌ল ;—মদের নেশা জেঙ্গোরাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। উৎসবে একটা-নতুন রকম নাচ নাচবে বোলে কোয়াঞ্জি একটা মুখস তৈরি করতে দিয়েছিল, কিন্তু সেবার কি-যে হল, কাজের প্রতি জেঙ্গোরার কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

দিনের পর দিন যায়, উৎসব ক্রমেই ঘনিয়ে আসচে, তবুও জেঙ্গোরা অচল। তার স্ত্রীপুত্র সবাই মিলে তাকে বলতে লাগল, কিন্তু সে যেমন নেশায় ভোর হয়ে ছিল তেমনি ভোর হয়ে রইল। শেষে যখন উৎসবের আর দুদিন মাত্র বাকি তখন কোয়াঞ্জি নিজে এসে সাধ্য-সাধনা আরম্ভ করলে।

কোয়াঞ্জিকে দেখে জেঙ্গোরা উঠে বসল বটে কিন্তু তার হাত তখনও নেশায় কাঁপচে। সে ভালো করে বাটালি ধরতেই পারলে না। যাই হোক্, দুদিনের মধ্যে কোনো-রকমে সে মুখসটা তৈরি করে ফেল্লে।

উৎসবের দিন সন্ধ্যাবেলা, জেঙ্গোরা তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, মুখসটা হাতে করে কোয়াঞ্জির বাড়ী গেল।

কোয়াঙ্গি তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে মুখসটা নিয়ে নিজের মুখে একবার পরে দেখলে।

কিন্তু মুখসটা বড় হয়ে গেছে—এত বড় হয়ে গেছে যে মুখে থাকে না, ঢলঢল্‌-কোরে খুলে পড়ে!

আর সময় নেই। আজ রাত্রেই সেই নাচ;—মুখস না হলে, সে নাচ হবে না। জেঙ্গোরার জন্যে সব মাটি! কোয়াঙ্গি ভয়ঙ্কর রেগে উঠল; সে আর নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে জেঙ্গোরার পিঠের উপর সজোরে এক লাথি মার্‌লে। জেঙ্গোরা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তার ছেলে ছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে। বাপের এই অপমান দেখে তার সর্ব্বশরীর জ্বলতে লাগল। কিন্তু সে কি করবে? সে ছেলেমানুষ! কোয়াঙ্গির অসীম প্রতাপ! সে নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কেবল ফুল্‌তে লাগল।

নেশা করে-করে জেঙ্গোরার শরীরের ক্ষয় হয়ে এসেছিল—এই আঘাত সে কাটিয়ে উঠতে পার্‌লে না; তাতেই তার মৃত্যু হল।

* * * *

অনেক দিন কেটে গেছে। জেন্দোরার নাম তখন লোকে একরকম ভুলে গেছে; আর-একজন নতুন কারিগরের নাম তখন বাজারে জেগে উঠচে। সে নাকি চমৎকার মুখস তৈরি করে।

কোয়াঞ্জি অনেকদিন ধরে একজন ভালো কারিগরের সন্ধান করছিল। সেইই উৎসবের সময় ঠিকমতো মুখস তৈরি হয়নি বোলে তার আর এপর্য্যন্ত সেই নূতন নাচটা নাচা হয়নি,—সেই জন্যে তার মনে ভারি ক্ষোভ ছিল। এই কারিগরের সন্ধান পেয়ে তার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল—সে তখনই তাকে ডেকে পাঠালে।

কারিগর যখন এল, তখন কোয়াঞ্জি খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলে কেমন-ধারা মুখস তৈরি করতে হবে। কারিগর মন দিয়ে সব শুনলে; সাবধানের সঙ্গে মাপজোক সব ঠিক করে নিলে।

তারপর যখন মুখস তৈরি হয়ে এল তখন কোয়াঞ্জি একেবারে অবাক—এ যেন ঠিক জেন্দোরার হাতের কাজ! এমনটা সে আশা করেনি।

সেই মুখস পরে সে নাচতে গেল; সেদিনকার নাচ অনেক দিন পরে আবার খুব জমে উঠলো। কোয়াঞ্জি মনের আনন্দে ঘুরে-ফিরে সেই নাচ বার-বার নাচলে;—চারিদিকে বাহবা পড়ে গেল।

তার পর, সেই রাত্রে, সে যখন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এল, তখন মুখ থেকে মুখস খুলতে গিয়ে দেখে মুখস আর খোলে না। টানাটানি করতে-করতে মুখ যতই ফুলে উঠল—কাঠের মুখসটা ততই এঁটে বসে যেতে লাগল। প্রাণ যায়!

কোয়াঞ্জি হুকুম দিলে—কারিগরকে ডেকে নিয়ে আয়—সে এসে মুখস খুলুক।

কারিগর এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

কোয়াঞ্জি হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্লে—"মুখস যে খোলে না! শিগ্গির খুলে দাও; প্রাণ গেল!"

কারিগর গম্ভীরভাবে বল্লে—"কি করব হুজুর! সেবার আমার বাবার হাতের মুখস আপনার মুখ থেকে খুলে পড়েছিল বলে আপনি তাঁর প্রাণবধ করেছিলেন—সেইজন্য আমি সাবধান হয়েছি—যাতে মুখ থেকে আর

মুখস না খোলে! এতদিন ধরে' আমি এই বিদ্যা আয়ত্ত করবার সাধনাই করছিলুম।"

এই কথা বলে সে হেসে উঠল।

কোয়াঞ্জি সেই বিকট হাসিতে জ্ঞানশূন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ভাল্লুক

১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সহরে একটা ভয়ানক হৈচৈ পড়িয়া গেল। গভরমেণ্ট হইতে ভাল্লুক বধ করিবার যে হুকুম জারি হইয়াছিল তাহা তামিল করিবার সময় আসিয়াছে।

চারিদিক হইতে ডুগডুগি-হাতে বাজীকরের দল ছাগল-ঘোড়া-ভাল্লুক-সমেত তাদের সারা সংসারটি ঘাড়ে করিয়া বিষণ্ণ মনে সহরে সমবেত হইতেছিল।

সহরে প্রায় শতাধিক ভাল্লুক জড়ো হইয়াছে। এতটুকু বাচ্ছা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়সের পরিপক্কতায়

গায়ের রং কটা হইয়া গেছে এমনধারা প্রকাণ্ড-চেহারা বুড়ো ভাল্লুক পর্য্যন্ত তার মধ্যে ছিল।

রাজ-সরকারের মেয়াদ ছিল—পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে আর কেহ ভাল্লুক লইয়া খেলা দেখাইতে পারিবে না। সে মেয়াদ এইবার ফুরাইয়াছে। এখন সকলকে নিজের নিজের ভাল্লুক লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইতে হইবে এবং নিজের হাতে তাদের বধ করিতে হইবে।

ডুগডুগি-হাতে ছাগল-ভাল্লুক-সঙ্গে বাজীকরের দল গ্রামে-গ্রামে তাদের শেষ-ঘোরা শেষ করিয়াছে। এই শেষ-বারের মতো গ্রামের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দূরে মাঠের মধ্য হইতে তাদের সাড়া পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তাদের দিকে ছুটিয়া গিয়াছে এবং সবাই মিলিয়া মহা গণ্ডগোল করিতে-করিতে গ্রামের মধ্যে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছে।

তখন সেখানে সে কী আনন্দ!—যেন একটা মহোৎ-সব! ভাল্লুকেরা নিজ নিজ কেরামতি দেখাইতে লাগিয়া গেছে;—নাচিতেছে, ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতেছে, ছেলেরা কেমন করিয়া খাবার চুরি করিয়া খায় তাহা দেখাই-

হতেছে। যুবতীর চলচলে গতি, বুড়ীর থপ্‌থপে চলা, এঁকে-বেঁকে চলা একেবারে অবিকল নকল করিতেছে। আর সকলে হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছে। এই শেষবারের মতো, তাদের প্রাপ্য মামুলী পুরস্কার—তাড়ির ভাঁড় তাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে;—তাহারা দুপায়ে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, ভাঁড়টাকে বড়-বড় নখওয়ালা থাবা দিয়া ধরিয়া,ঘাড়টা পিছন দিকে নীচু করিয়া,গলার মধ্যে ঢক্‌ঢক্ করিয়া তাড়ি ঢালিতেছে। ভাঁড় শেষ হইয়া গেলে জিব দিয়া ঠোঁটটা একবার মুছিয়া লইতেছে; তারপর তৃপ্তির উচ্ছ্বাসে একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ করিয়া গভীর নিশ্বাস ছাড়িতেছে।

এ-সুযোগ ইহজীবনে আর মিলিবে না! যত বুড়োবুড়ি, তাদের নাছোড়বান্দা ঘ্যান্‌ঘেনে রোগ সারাইবার জন্য ভাল্লুকের শরণাপন্ন হইয়াছে। এ একেবারে অব্যর্থ! বহু পরীক্ষিত! ভাল্লুকের স্পর্শ—যত বড় দুরারোগ্য রোগ হোক না কেন, নিশ্চয় আরাম করিবে। গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে ভাল্লুক লইয়া বেড়ানো হইতেছে। ভাল্লুক যার ঘরের দরজা ঠেলিয়া দয়া

করিয়া একবার প্রবেশ করিয়াছে, তার সৌভাগ্য যে সে-ঘরে বাঁধা, এ তো ধরা কথা! সকলে তার শুভসূচনায় আনন্দ-কোলাহল করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও যে-ঘরে ভাল্লুকের শুভাগমন হইতেছে না, সে-গৃহস্থ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতেছে;—তার অমঙ্গল-আশঙ্কায় আর-সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে।......

সে-দিন সকাল হইতেই মেঘ করিয়া আছে। মধ্যে-মধ্যে এক-এক পশলা বৃষ্টিও হইতেছে। পথে কাদা এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও সহরের ছেলেবুড়ো, স্ত্রীপুরুষ সকলেই যেদিকে ভাল্লুক মারা হইবে, সেইদিকে ছুটিয়াছে। সহর প্রায় শূন্য। যত যানবাহন ছিল, কোনোটারই অবসর নাই। সবগুলো বাজীকরদের আড্ডার দিকে দৌড়িয়াছে। লোক বোঝাই করিয়া সেখানে আনিয়া ফেলিতেছে, এবং আবার নূতন বোঝাইয়ের জন্য সহরের দিকে ছুটিতেছে। বেলা দশটার মধ্যে সহরের যত-লোক ঝাঁটাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।

বাজীকরের দল তখন একটা নৈরাশ্যে একেবারে

মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের তাঁবুর মধ্যে আর সাড়াশব্দটি নাই। পাছে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড চোখের সম্মুখে ঘটে সেই ভয়ে কাচ্ছাবাচ্ছা লইয়া মেয়েরা তাঁবুর ভিতর লুকাইয়া পড়িয়াছে। পুরুষেরা একটা উত্তেজনাপূর্ণ ব্যস্ততার সঙ্গে শেষ-কাজের সব বন্দোবস্ত করিতেছিল। ঠেলাগাড়িগুলো তাহারা বধ্যভূমির এক কিনারায় টানিয়া আনিয়াছে এবং তাহার দাণ্ডায় ভালুকগুলোকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

সহরের কোতোয়াল ঐ সারবাঁধা দাঁড়ানো হতভাগ্য-দের সমুখ দিয়া একবার চলিয়া গেল। ভালুকগুলা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাদের চোখে আজ সবই নূতন ঠেকিতেছিল! অদ্ভুত রকমের আয়োজন, অসম্ভব জনতা, একসঙ্গে এত ভালুকের ভিড়—এই সমস্ত ব্যাপার তাদের মধ্যে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল। গলায়-বাঁধা শিকলটার উপর থাকিয়া থাকিয়া তারা হেঁচ্‌কা মারিতে-ছিল; এক-একবার সেটা সজোরে কামড়াইয়া ধরিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে একটা অর্দ্ধস্ফুট গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ আইভান্ রাগের ভরে বাঁকিয়া তাহার সেই প্রকাণ্ড

ভাল্লুকটির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ছিল ; কাছে তাহার ছেলে ; আধা-বয়সী, কাঁচায়-পাকায় চুল ;—এবং তাহার নাতী, ভয়ঙ্কর মুখ এবং রক্তবর্ণ চোখ পাকাইয়া ভাল্লুকটিকে বাঁধিতেছিল। কোতোয়াল সাহেব এই তিন প্রাণীর কাছ-ঘেঁসিয়া আসিয়া হুকুম দিল—"ব্যস্! এইবার কাজ ক কর্‌তে বল।"

একটা উত্তেজনার প্রকাণ্ড ঢেউ দর্শকমণ্ডলীর উপর দিয়া খেলিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কথাবার্ত্তার গুঞ্জন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার সব চুপ-চাপ হইয়া গেল। তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতা হইতে কাহার তেজ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ফুঁড়িয়া উঠিল। আইভান্ কথা আরম্ভ করিয়াছে।

—"মশায়গণ, আমায় কিছু বল্‌তে দিন!"

তারপর বাজীকরদের দিকে ফিরিয়া সে বলিতে লাগিল— "বন্ধুগণ, ক্ষমা কোরো। আমি সব প্রথমে বল্‌বার জন্যে দাঁড়িয়েছি। আমি তোমাদের সবার চেয়ে বয়সে বড়—নব্বই বছরে পড়তে আমার আর দেরী নেই। এই এতটুকু বেলা থেকে আমি ভাল্লুক নাচাচ্ছি,

আমার সমবয়সী ভাল্লুক এই এত তাঁবুর মধ্যে একটিও নেই।"

সে তাহার সেই পাকা মাথা একবার নীচু করিল,—কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ তার বুকের উপর আসিয়া পড়িল; মাথাটা সে একবার এধার-ওধার-করিয়া নাড়িল, তারপর বদ্ধমুষ্টির এক ঝট্‌কানিতে চোখ দুটা মুছিয়া লইল। এবং আগের চেয়ে উচ্চ এবং দৃঢ়স্বরে আরম্ভ করিল—

—"সেই জন্যই আমি সব-প্রথম বলবার দাবী করচি। আমি ভেবেছিলুম আজকের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য এ-বুড়োকে আর দেখতে হবে না;—আমার ভাল্লুকের আগে আমারই দেহপাত হবে। কিন্তু অদৃষ্ট বিরূপ! তাই নিজের হাতে আজ তাকে বধ করতে হচ্চে! যে আমার চির-জীবনের সঙ্গী, যে আমার বন্ধু, যে চিরদিন আমায় অন্ন-দান করেছে, যার দৌলতে আমার সংসার-প্রতিপালন হয়েছে—তাকেই আজ স্বহস্তে বধ করতে হবে! ওরে ভাসিয়া! ওর বাঁধন খুলে দে! ভয় নেই, পালাবে না। আমাদের মতো বৃদ্ধদের যেমন মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, ওরও তেমনি

পালাবার যো নেই। ভাসিয়া, আজ খুলে দে! ওরে বেঁধে মারতে আমি পারব না।"

ভাল্লুকের বাঁধন খুলিয়া দিবার কথা শুনিয়া দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে ভয়ের একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। আইভান তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিল—"ভয় নেই, ভয় নেই! ও কিচ্ছু বলবে না!"

যুবক আসিয়া ভাল্লুকের গলার শিকলটা খুলিয়া দিল এবং ঠেলাগাড়িটার কাছ হইতে তাহাকে কিছু দূরে সরাইয়া লইয়া গেল। ভাল্লুকটা মাটির উপর উবু হইয়া বসিল—তার সামনের থাবা-দুটো শিথিলভাবে ঝুলিয়া এধারওধার দুলিতে লাগিল। একটা ঘড়্ঘড়ে নিশ্বাস তার বুকের ভিতর হইতে অতি কষ্টের সহিত বাহির হইতেছিল।

বাস্তবিকই সে অত্যন্ত বৃদ্ধ; দাঁতগুলা একেবারে হল্‌দে হইয়া গেছে, গায়ের লোমগুলার উপরে একটা তামাটে ছোপ পড়িয়াছে; লোমও বিরল হইয়া আসিতেছে। একটা স্নেহপূর্ণ অথচ করুণ চাহনি লইয়া একচোখে সে তাহার প্রভুর পানে চাহিতে লাগিল। চারিদিকে

গম্ভীর স্তব্ধতা, কেবল মধ্যে-মধ্যে বন্দুকে টোটা পুরিবার একটা শব্দ সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল—"দে, আমার বন্দুকটা এনে দে!"

পুত্র বন্দুক আনিয়া দিলে সে গ্রহণ করিল। তার পর বন্দুকের চোং ভাল্লুকের বুকের উপরে রাখিয়া বলিতে লাগিল—"প্রতাপ! আর মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার হাতে তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। ঈশ্বর করুন, এ সময় যেন আমার হাত না কাঁপে, গুলি যেন একেবারে তোমার মর্ম্মস্থলে গিয়ে বিদ্ধ হয়—দগ্ধে যেন তোমায় মর্‌তে না হয়। হে আমার চিরদিনের বন্ধু! আমি তোমায় যন্ত্রণা দিতে পার্‌ব না! তুমি যখন এতটুকু, তখন তোমায় ধরেছিলুম। একটি চোখ তোমার গেছে; শিকলের ঘস্‌ড়ানিতে নাক তোমার ক্ষয়ে এসেছে; ভিতরেও তোমায় ক্ষয়-রোগে ধরেছে। নিজের ছেলের মতো তোমায় বুকে ক'রে মানুষ করেছিলুম। সেই এতটুকু থেকে দেখ্‌তে-দেখ্‌তে তুমি কি প্রকাণ্ড, কি বলবান্ হ'য়ে উঠ্‌লে।—আজকের এই এত ভাল্লুকের মধ্যে তোমার

জুড়ি তো একটি দেখি না। আমার সেই স্নেহযত্ন তুমি ইহজীবনে একমুহূর্ত্তের জন্যও তো ভোলোনি ;—তোমার মতো এমন বন্ধু আমি কোথায় পাব? আমার কাছে তুমি কি শান্ত, কি স্নেহশীল ছিলে! যখন যে খেলা শিখিয়েছি, কখনো অবহেলা করনি—কোনো-রকম খেলা শিখ্‌তে তোমার আর বাকি নেই। তোমার মতো গুণ কার আছে? তুমি আমার ঘরে না এলে আমার কি দুর্দ্দশা হ'ত, কে জানে! তোমারই পরিশ্রমে আমার সংসার-প্রতিপালন হয়েছে—আমার এত সুখস্বচ্ছন্দ! তোমার দৌলতে আমার কি না হয়েছে?—শীতে আশ্রয় পেয়েছি, ক্ষুধায় অন্ন পেয়েছি ;—আমার এত-বড় সংসারে ছেলেবুড়ো কাউকে তুমি কোনো দুঃখ পেতে দাওনি। আমি তোমাকে ভালোও বেসেছি—প্রহারও করেছি। যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, ক্ষমা কোরো।" বলিয়া সে ভাল্লুকের পায়ের কাছে একেবারে প্রণত হইয়া শুইয়া পড়িল। ভাল্লুকটা কেমন-একটা করুণ সুরে গুমরাইতে লাগিল। আইভানের সমস্ত শরীরটা একটা উচ্ছ্বসিত কান্নার হিল্লোলে কেবল উঠিতে-পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ উঠিয়া বন্দুক তুলিয়া ধরিল। ভাল্লুক মনে করিল, বুঝিবা তাহাকে লাঠির সঙ্কেতে নাচিতেই বলা হইতেছে। সে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া নানান্ ভঙ্গিতে নাচ সুরু করিয়া দিল।

—"বাবা! শীঘ্র গুলি কর! এ দৃশ্য অসহ্!" বলিয়া তার ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আইভান্ পিছে হটিয়া দাঁড়াইল। তার চোখে আর জল নাই। মুখের উপর এক-রাশ কুঞ্চিত কেশ আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে সজোরে উঠাইয়া দিল। তার পর দৃঢ়-গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিল—"এইবার আমার হাতে তোমার শেষ! রাজার হুকুম, এই বুড়োকেই নিজের হাতে তোমার বুকে গুলী দাগ্‌তে হবে! ইহলোকে থাকবার আর তোমার অধিকার নেই। কিন্তু কেন?"—

আইভান দৃঢ় অকম্পিত হস্তে ভাল্লুকের বুকের উপর বন্দুকের ঘোড়া টিপিয়া ধরিল।

ভাল্লুক এইবার বুঝিতে পারিল। সে অবাক্ হইয়া তার প্রভুর-দিকে চাহিল। একটা মর্ম্মান্তিক করুণ ... নিশ্বাস তাহার বুক-ফাটিয়া বাহির হইয়া গেল ... ... সে

পিছনের পায়ে ভর দিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং সাম্‌নের থাবা-দুটা চোখের সমুখে তুলিয়া ধরিল—যেন ঐ অসম্ভব দৃশ্যের দিকে সে চাহিতে পারিতেছে না! …বাজীকরদের ভিতরে চতুর্দ্দিকে একটা মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিল; জনতার মধ্যে কাহারো-কাহারো চোখে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ আইভান্ একবার কাঁপিয়া উঠিয়া হাতের বন্দুকটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল; সঙ্গে-সঙ্গে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য তার পুত্র দৌড়িয়া আসিল; পৌত্র বন্দুকটা হাতে তুলিয়া দাঁড়াইল।

জলন্ত চক্ষু লইয়া উন্মাদের মতো চীৎকার করিয়া সে বলিল—"ভাইগণ! যথেষ্ট হয়েছে! আর নয়—এইবার শেষ ক'রে ফেল!"

বলিয়া সে ভাল্লুকটার দিকে ছুটিয়া গেল; তার কানের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছাড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাল্লুকটা একটা প্রকাণ্ড নির্জ্জীব স্তূপের মতো ধ্বসিয়া পড়িল।

খানিকক্ষণের জন্য তার থাবাগুলোর মধ্যে কেবল

একটা স্পন্দন দেখা গেল—তার পর সব ঠাণ্ডা !…চারিদিকে তখন শুধু বন্দুকের ফট্-ফট্ আওয়াজ আর রমণী ও শিশু কণ্ঠের শোকার্ত্ত কান্নার শব্দ! তার পর সব নিস্তব্ধ। কেবল একটা হাল্‌কা হাওয়া—ধোঁয়ার পুঞ্জকে ধীরে-ধীরে নদীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

উড়ো-চিঠি

জাপানে যুবক-যুবতীর মধ্যে প্রণয় যখন প্রগাঢ় হইয়া উঠে, তখন তাহারা বিবাহের প্রতিজ্ঞাস্বরূপ গোপনে উপহারবিনিময় করে ; কেহ আংটি, কেহ আয়না, কেহ-বা কারুকার্য্য-করা একটি ছোট জাপানী বাক্স দেয়। এই উপহারের কথা কেহ জানিতে পারে না, কাহাকে জানিতে দেওয়া হয় না; কারণ, ধরা পড়িলে লজ্জার সীমা থাকে না।

অনেক দিনের কথা। টোকিও সহরে সামুরাই-বংশীয় জনৈক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁহার একটিমাত্র পুত্র। তার পড়াশুনায় এমন মন যে, তেমন-

ধারা বড়-একটা দেখা যায় না। দিনরাতই হাতে বই ;—একেবারে পুঁথির কীট!'

হঠাৎ একদিন তাহার পিতা একখানা উড়ো-চিঠি পাইলেন। তাহাতে লেখা আছে যে, "তোমার ছেলে তোমার অমুক প্রতিবাসীর কন্যার প্রণয়-মুগ্ধ। ব্যাপার বড় সঙিন্! প্রণয়ী-যুগল গোপনে গৃহত্যাগ করিবার মতলব করিয়াছে। সাবধান, তোমার শুভ্র বংশে যেন কলঙ্কের কালিমা না পড়ে!"

চিঠি পড়িয়া পিতা অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার ছেলে প্রণয়-মুগ্ধ? কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! যে কেতাব হইতে মুখ তুলিয়া কখনো কোনো মেয়ের পানে চাহিয়াছে কি না সন্দেহ, সে প্রেম করিবে কেমন করিয়া?

যাহা হোক, তিনি ভাবিলেন, কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন তাহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। তিনি গৃহিণীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন।

গৃহিণী সকল-কথা শুনিয়া বলিলেন—"এর আর আশ্চর্য্য কি? প্রেম তো অন্তঃসলিলার মতো গোপনেই বহে যায়। তোমার নিজের কথা কি মনে নেই?

আমাদের বিয়ের আগে তোমার প্রেমের কথা কে জানত বল না!"

মাথা-চুলকাইয়া কর্ত্তা বলিলেন—"হ্যাঁ, তা বটে।"

গৃহিণী তখন বলিলেন—"তবে আর সন্দেহের মধ্যে থাকবার দরকার কি? ছেলের বিয়ে তো দিতেই হবে; কাজটা এখনই চুকিয়ে ফেল।"

কর্ত্তা কন্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কন্যার পিতা তাঁহার মুখে সকল কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্! তাঁর মেয়ের মতো লাজুক জাপানে আর-একটি মেয়ে আছে কি না সন্দেহ। তার এত লজ্জা যে, বাপের ভাবনা ছিল, মেয়ের বিয়েই হয় কি না। সেই মেয়ে প্রেম করিয়াছে, এ তো বিশ্বাস হয় না। যাহা হোক, এই সুযোগে যখন একটি বর জুটিয়া গেল, তখন হাত-ছাড়া করা উচিত নয়। তিনি বিবাহে মত দিলেন।

মেয়ের মা এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, —"এ যে শাপে বর হ'ল দেখ্‌চি!"

বিবাহের আয়োজন যখন চুপি-চুপি চলিতেছে, তখন হঠাৎ একদিন বই হইতে মুখ তুলিয়া ছেলেটি শুনিল,

পাড়ার এক মেয়ের সহিত তাহার গুপ্ত-প্রণয় লইয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গেছে। সে অবাক্ হইয়া বলিল—"কোন্ মেয়ে? কে সে?"

বন্ধুরা তাহাকে সেই মেয়ের কাছে ধরিয়া লইয়া গিয়া মুখ-টেপা হাসি হাসিয়া বলিল—"এখন চিন্‌তে পারুচ?"

ছেলেটি বলিল—"কৈ, আমি তো এঁকে কখনো দেখিনি!" বলিয়া সে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে তাহার মনে হইল, কেতাবের অক্ষরগুলার চেয়েও একটা বেশী আকর্ষণ যেন মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ হইতে হাত-ছানি দিতেছে।

মেয়েটি কখনো কাহারো পানে মুখ-তুলিয়া চাহে না; আজ তাহার ভারি ঔৎসুক্য হইল, যাহার সঙ্গে তাহার গুপ্তপ্রণয় লইয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে, সে কে? সে একটুখানি মুখ-তুলিয়া আড়-চোখে ছেলেটিকে একবার দেখিল, তার পর লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। ছেলেটির মনে হইতেছিল, গুজব যদি সত্য হইত তো মন্দ হইত না। মেয়েটি মনে-মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে!

বন্ধুরা জেদ ধরিয়া বলিল—"এইবার স্বীকার কর !"

ছেলেটির ভারি লজ্জা হইল ; সে বলিল—"যা সত্যি নয়, তা কেমন ক'রে স্বীকার করি ? সত্যি এঁকে আমি চক্ষে কখনো দেখিনি !"

তাহার এ-কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। তাহাদের নামে কলঙ্ক ক্রমে বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। এমন সময় মেয়েটির সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ছেলে শুনিয়া আনন্দিত হইল। কিন্তু লোকে যখন বলাবলি করিল, এ কথা ত জানাই ছিল, তখন ছেলের মন ভারি রুখিয়া উঠিল ; সে ভাবিল, এ বিবাহে যদি রাজি হই, তাহা হইলে লোকের দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়া যাইবে, নিশ্চয় গুপ্তপ্রেম ছিল। অভিমানের সঙ্গে সে বলিল—"আমি বিয়ে করব না।"

এই কথা শুনিয়া পাড়ার লোক প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল; তার পর বলাবলি করিল, "নিশ্চয় এর ভিতর একটা চাল আছে।" তাহারা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিল—"বিয়ে কর্‌বে না কেন হে বাপু ?"

সে বলিল—"যার সঙ্গে আমার জানা-শোনা নেই, তাকে আমি বিয়ে কর্‌তে যাব কেন?"

সকলে চোখ-টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"বটে!"

ছেলেটি মনে-মনে ভাবিল, এ তো আচ্ছা বিপদ্‌! তাহার মন তখন এই সব জঞ্জাল হইতে দূরে নিরালায় নির্জ্জনে একটি গোপনতার ফাঁক খুঁজিতেছিল। কিন্তু হায়, কোথায় সে ফাঁক!

গোলমাল যখন খুব ঘন হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল যে, উড়ো-চিঠিখানা একটা পরিহাসমাত্র—তাহাতে সত্য কিছুই নাই।

ছেলেটি হাঁফ-ছাড়িয়া বাঁচিল; কিন্তু পাড়ার লোকে এই পরিহাসের কথাও হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহারা বলিল—"তাও কখনো-হয়?" ছেলেটি তখন মনে মনে কি ভাবিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিল—"এত কথাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, তা হ'লে সকলকার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমি বল্‌ছি, আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া হোক্‌।"

সত্যই সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। তাহাতে লোকের সন্দেহ মিটিল। কানাঘুষা বন্ধ হইল। ছেলেটি দেখিল,

এই সুযোগ; আর কেহ টের পাইবে না,—সে নিজের হাতের আংটি খুলিয়া চুপি-চুপি সেই উড়ো-চিঠির মেয়েটিকে পাঠাইয়া দিয়া দুরুদুরু-হৃদয়ে বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই লজ্জার মতো সাক্ত-শুভ্র মখমলে জড়ানো সোনার কৌটার মধ্যে মেয়ের হাতের আংটি আসিয়া উপস্থিত হইল।

জলছবি

ভিখারীর দান

আমি পথ চলিতেছিলাম। এক জরাজীর্ণ ভিখারিনী আমাকে দাঁড় করাইল।

কঙ্কালসার দেহ বার্দ্ধক্যে নুইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বশরীর ক্ষুধার তাড়নায় কাঁপিতেছে। কোটরগত চক্ষু—মৃত, নিষ্প্রভ; তারা-দুটোর উপরে কে যেন মাটির কঠিন প্রলেপ টানিয়া দিয়াছে। শতচ্ছিন্ন বসন ধূলাকাদায়

ভরা, এত স্বল্প যে, তাহাতে সম্পূর্ণ লজ্জা রক্ষা হইতেছে না…লাঠিতে ভর দিয়া ধুঁকিতে-ধুঁকিতে সে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল…চোখের সম্মুখে মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য!

ঘাড়টা অনেক কষ্টে কাঁপাইতে কাঁপাইতে তুলিয়া সে তাহার সেই আড়ষ্ট চোখে আমার দিকে তাকাইল… শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া একটা মর্ম্মান্তিক কাতরতার সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!"

তাহার সেই করুণ কণ্ঠস্বর আমার বুকের পাঁজরে গিয়া বিঁধিল।

আমি ব্যস্ত হইয়া পকেট হাতড়াইতে লাগিলাম… একটি কাণা-কড়িও নাই…কি করি?

সে আবার বলিল—"কিছু ভিক্ষে দাও বাবা!"

আমি নিরুপায়ে অস্থির হইয়া তাহার সেই ভিক্ষার হাতখানা নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিলাম। বলিলাম, "মা—" আমার আর কথা বাহির হইল না।

"ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"—বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর বন্ধ হইবার উপক্রম করিল…সেই নিষ্প্রভ চোখে

ক্ষণেকের জন্ম একটু জীবনের আলো হাসিয়া উঠিল…
তাহার কম্পিত হাতখানা আমার কপালে ঠেকাইয়া
সমস্ত হৃদয় দিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আয় বাবা, কাছে
আয়…ভগবান্ তোর মঙ্গল করুন !"…

আমার বোধ হইল, একটি পরিপূর্ণ মঙ্গলের স্পর্শে
আমার ললাট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আমি তাহাকে কিছুই দিতে পারিলাম না; কিন্তু
ভিখারিণী আমায় যথেষ্ট দিয়া গেল।

স্নেহের জয়

শীকারের পর বনের মধ্য দিয়া বাড়ী ফিরিতে-
ছিলাম। সঙ্গে কুকুরটা ছিল।

হঠাৎ দেখি, সে গতি মন্থর করিয়াছে, শুঁড়ি-
মারিয়া চলিতেছে, চক্ষু-দুইটা বাহির করিয়া লোলুপ
দৃষ্টিতে একটা ঝোপের দিকে চাহিতেছে।

আমি সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম।

একটি চড়ুই-পাখীর ছানা বাসা হইতে ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে...এখনও সে উড়িতে শিখে নাই...মাটিতে উল্টাইয়া পড়িয়া হলুদবর্ণ কচি ডানা-দুটি কেবলই ধীরে-ধীরে নাড়িতেছে।

কুকুরটা বকের মতো সাবধানে পা-ফেলিয়া ফেলিয়া চলিতেছিল। হঠাৎ ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ শব্দ করিয়া একটা ধাড়ি-চড়ুই গাছের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া মাটীতে পড়িল—একেবারে কুকুরটার সামনে! কি তার আর্ত্তনাদ! অতটুকু কণ্ঠ, কিন্তু তাহাতেই মনে হইতেছিল যেন সমস্ত বনটা কাঁপিয়া উঠিতেছে।

"রক্ষা কর! রক্ষা কর!"—আমি ঠিক শুনিলাম, পাখীটার আর্ত্তনাদ হইতে যেন একটা কাতর প্রার্থনা বাহির হইতেছে—"রক্ষা কর! রক্ষা কর।"......কিন্তু কে রক্ষা করে?

কুকুরটা তখন ছানাটার প্রায় সামনে গিয়া পড়িয়াছে;—যেন যমদূত।

ধাড়ি-পাখীটা দুইবার ডানা তুলিয়া কুকুরটার

মুখের উপর ঝাঁপাইয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিল।···কুকুরটার সাদা-সাদা তীক্ষ্ণ দাঁতগুলা তার চোখের সামনে অমনি ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল। সে ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু প্রাণের ভয়ে উড়িয়া পলাইল না···ডানা-দুটি মেলিয়া ছানাটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া পড়িয়া রহিল।

ঐ অতটুকু চড়ুই-পাখীর সামনে কুকুরটাকে মনে হইতেছিল যেন একটা প্রকাণ্ড দানব!

কুকুরটা একবার ফোঁস্ করিয়া উঠিল। চড়ুই-পাখীর সমস্ত দেহটা তাহাতে শিহরিয়া উঠিল বটে; কিন্তু তবু সে ছানাটিকে ছাড়িল না—তার উপর আরো বেশী-করিয়া বুক দিয়া পড়িল।

কুকুরটা এইবার রীতিমত আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পাখীর সেই অটল নির্ভয় মূর্তির সাম্‌নে তাহাকে পিছু-হটিতে হইল;—স্নেহের শক্তির কাছে তাহার হিংস্রতার প্রতাপ হার মানিয়া গেল।

আমি তখন সেই হতভম্ব কুকুরটাকে ডাকিলাম। সে ভয়ে-ভয়ে আমার দিকে ফিরিয়া আসিল। আমি একটা

সম্ভ্রমের সহিত চড়ুইটার দিকে তাকাইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

সম্ভ্রমের কথা শুনিয়া হাসিও না। সত্যই সেই পাখীটার উপর আমার সম্ভ্রম জন্মিয়াছিল। মরণকে যে অবহেলা করিতে পারে, তার আকার ক্ষুদ্র হইলেও সে কি সামান্য?

আর, এই স্নেহ, যাহা প্রত্যক্ষ মরণকেও গ্রাহ্য করে না, তাহা এই সংসারে দুর্লভ নয় বলিয়াই তো মৃত্যু এখনো জীবনকে ধ্বংস করিতে পারে নাই।

দানের তুলনা

ধনকুবের রথস্চাইল্ডের কথা যখনই ভাবি, তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় ভরিয়া উঠে। কত দিকে কত বিরাট্ তাঁহার দান—শিক্ষা, ধর্ম্ম, আর্ত্তসেবা, আরো কত কি!

কিন্তু তাঁর উপর যতই শ্রদ্ধা আমার থাকুক, তাঁরকথা মনে হইলেই আর-একজনকার কথা আমার মনে পড়ে।

দানের তুলনা

সে-দিন আমাদের গ্রামের এক গরীব চাষা পিতৃ-মাতৃহীন এক অনাথ বালিকাকে বুকে লইয়া যখন তার ভগ্ন কুটীরে প্রবেশ করিল, তখন গ্রামসুদ্ধ সবাই তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল—"হতভাগা আপনি পায় না খেতে, আবার শঙ্করারে ডাকে!"

এত লোকের তিরস্কারে সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু যখন তাহার গৃহিণী সেই মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া তাহার মুখে চুম্বন দিতে-দিতে বলিল, "ভয় কি!" তখন তাহার সমস্ত ভাবনা যেন কোথায় তলাইয়া গেল।

সে-দিন ঐ নিঃস্ব কৃষক-পরিবার চুম্বনের যে খয়রাৎ করিয়া ফেলিল, তাহাতে আমার মনে হয়, ধনকুবের রথস্‌চাইল্ড এই গরীবদের অনেক পিছনে পড়িয়া গেলেন।

প্রকৃতির মন্দির

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, যেন মাটির তলায় অনেক নীচে এক মন্দিরে আসিয়াছি। মন্দির অন্ধকার; কিন্তু সে আঁধার চোখে সহিয়া গিয়া ক্রমে সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইতে লাগিলাম।

মন্দিরের ঠিক মাঝখানে বেদীর উপরে এক রমণী;—তাঁহার সুদীর্ঘ সবুজ অঞ্চল দিগ্বিদিকে লুটাইতেছে—হাতে মাথা রাখিয়া তিনি ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন।

দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনি স্বয়ং প্রকৃতিরাণী। সম্ভ্রম ও আতঙ্কের একটা চঞ্চল প্রবাহ আমার অন্তর-দেশ পর্য্যন্ত বহিয়া গেল।

আমি ধীরে-ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—"জগৎ-জননি! আপনার এই ভাবনা কিসের জন্য? মানুষের ভবিষ্যৎ?—কিসে তারা জগতে চরম উন্নতি—পরম শান্তি লাভ করবে, তাই?"

কৃষ্ণ কালো আঁখি ফিরাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"না।"

তখনো আমার কৌতূহল মেটে নাই দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"আমি ভাব্ছি ঐ উন্‌কি-পোকার পা-গুলো কি ক'রে আরো একটু সবল করা যায়—যাতে তারা সহজে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর্‌তে পারে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার মাপ-কাঠি গরমিল হয়ে যাচ্ছে—সেইটি ঠিক ক'রে দিতে হবে।"

আশ্চর্য্য হইয়া আমি বলিলাম,—"সামান্ত উন্‌কি-পোকা, তার জন্তে এত ব্যাকুলতা? এত চিন্তা? আমি জান্‌তুম, মানুষই আপনার সব-চেয়ে প্রিয়—"

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন,—"সবাই আমার সমান প্রিয়। আমার কাছে মানুষের প্রাণ আর ক্ষুদে-পোকার প্রাণে কোনো তফাৎ নেই।"

—"কিন্তু" আমি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলাম—, "কিন্তু উচ্চ-নীচ, ছোটো-বড় ভেদাভেদ—"

—"ও সমস্ত মানুষের তৈরি-করা কথা!"

—"জ্ঞান-বুদ্ধি—বিচার-বিবেচনা—ন্যায়-অন্যায়-বোধ—"

—"ও-সমস্তই মানুষের নিজের তৈরি ;—আমার রাজ্যে ও-সব নেই। আমার আছে শুধু প্রাণ ;—সেই প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলা এখানে চলে। তা' সে মানুষের প্রাণই হোক, কি পোকামাকড় বা বাঘ-ভাল্লুকের প্রাণই হোক।"...

মানুষের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আরো-কি বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পৃথিবী এক গভীর আর্তনাদ করিয়া উঠিল—সমস্ত মেদিনী প্রলয়কালের মতো কম্পান্বিত হইয়া উঠিল।

আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

বাজপাখী

কি আশ্চর্য্য! একটা সামান্য ব্যাপারে মানুষের আগাগোড়া কেমন বদলাইয়া যায়।

মনটা সে দিন ভার—একটা আকস্মিক বিপদের দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত। আমি পথ চলিতেছিলাম।

বুকের উপর জগদ্দল-পাথরের ভার ক্রমেই চাপিয়া

বলিতেছিল—কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। যে-দিকে চাই, সেই-দিক্ হইতেই একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল।

হঠাৎ নজর পড়িল রাস্তার ধারের বাগানের উপরে। দুই-ধারে ঝাউগাছের শ্রেণী, মধ্যে সরু পথ। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে প্রভাত-সূর্য্যের আলো আসিয়া পথের উপর নানারূপ চিত্র রচনা করিয়াছে। শরতের বর্ষণ-চিহ্ন গাছের পাতায়-পাতায় মুক্তাফলের ন্যায় দুলিতেছে। গাছের ঝোপে-ঝোপে একটা হাসির ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে।—নীচে কতকগুলা পাখী সোনালী রোদে ডানা ছড়াইয়া নাচিতেছে, গাহিতেছে। কি তাহাদের আনন্দ! একেবারে নির্ভাবনা, নির্ভয়! কোনো-দিকে দৃক্‌পাত নাই—এমনি আনন্দে বিভোর! নাচিতেছে বুক ফুলাইয়া—যেন, কোনো কিছুতেই গ্রাহ্য নাই। এমনি তাহাদের ভঙ্গী, যেন, দুনিয়াখানার মালিক তাহারাই।

আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলাম। ছোটো ছোটো সাদা মেঘের ভেলা মনের আনন্দে নিঃশব্দে

বহিয়া চলিয়াছে।—সমস্ত আকাশটা খালি!—হঠাৎ দেখি, একটা কালো বিন্দু তীর-বেগে মাটির দিকে পড়িতেছে। কাছে আসিলে বুঝিলাম, বাজপাখী!

আমি নীচের দিকে চাহিলাম। তখনো পাখীগুলা নির্ভয়ে নৃত্য-গীত করিতেছে—আকাশের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সূর্য্যের আলোয় তাহাদের ডানার আনন্দ শত-দিকে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে!

আমার মনে হইল, তবে থাকুক আমার মাথার উপরে বিপদের বাজপাখী—আমি গ্রাহ্য করি না। ওদের মতে আমিও বুক-ফুলাইয়া স্ফূর্ত্তির সঙ্গে চলি আর বলি—"ভয় কাকে? ভাবনা কিসের?"

ক্রাইষ্ট

স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, যেন ছেলেমানুষ হইয়া গেছি। খুব নীচু ছাদওয়ালা অন্ধকার একটা গির্জ্জা, তার মধ্যে আমি। আমার চারিপাশে অনেক লোক। সকলেই

চুপ করিয়া আছে। কেবল থাকিয়া-থাকিয়া তাহাদের মাথাগুলো ঢেউয়ের মতো উঠিতেছে আর নামিতেছে।

হঠাৎ বোধ হইল, একটা লোক পিছন হইতে আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল।

আমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম না। কিন্তু আমার মনের ভিতর হইতে ইসারা করিয়া কে যেন দেখাইয়া দিল—উনি ক্রাইষ্ট!

ক্রাইষ্ট!—ঔৎসুক্য, উত্তেজনা, আতঙ্ক—সব ক'টা একসঙ্গে আসিয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

আমি দেখিলাম, সে একজন মানুষ-মাত্র। চেহারায় কোনো বিশেষত্ব নাই। সাধারণ লোকের মতো মুখ, সাধারণ লোকের মতনই ধরণ-ধারণ।

"এই ক্রাইষ্ট!" আমি ভাবিতেছিলাম—"এ তো একটা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ। এ ক্রাইষ্ট হইতেই পারে না।"

আমি চোখ ফিরাইয়া লইলাম। কিন্তু ফিরাইতে-না-ফিরাইতে আমার মনের ভিতর হইতে আবার কে

সজোরে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, উনিই ক্রাইষ্ট—ঐ মানুষই ক্রাইষ্ট।"

অমনি আমার বুকের মধ্যখান হইতে যেন একখানা প্রাচীন পাথরের মূর্ত্তি খসিয়া-পড়িয়া চূর্ণমার্ হইয়া গেল এবং সেই ফাঁকা জায়গাতে সাধারণ মানুষের মতো যে একখানি মুখ জাগিয়া উঠিল, ঠিক বোধ হইল, তাহা ক্রাইষ্টেরই বটে।

সম্পূর্ণ

মণিলাল বাবুর অন্যান্য বই

পাপড়ি (ছোট গল্প) ভালো বাঁধাই	...	১৲
মহুয়া (ছোট গল্প)	... ...	॥০
ঝাঁপি (ঐ)	... ...	॥০
আল্পনা (ঐ)	... ...	॥০
কল্পকথা (ঐ)	... ...	॥০
ভাগ্যচক্র (বিদেশী উপন্যাস)	...	১৲
জাপানী-ফানুস (সচিত্র শিশুপাঠ্য)	...	॥০
ঝুমঝুমি (ঐ)	... ...	।৵০
ভারতীয় বিদুষী (জীবনী)	...	॥৵০
কাদম্বরী (সম্পাদিত)	... ...	॥৵০
বেতালপঞ্চবিংশতি (ঐ)	... ...	॥৵০
ভুতুড়ে কাণ্ড (ছাপা নাই)		
মোমের ফুল (যন্ত্রস্থ)		

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা